Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞান প্রচারে নারীদের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আহমাদ

রোলঃ ২১৫০০১৫৫৬

২৬ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞান প্রচারে নারীদের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আহমাদ

রোলঃ ২১৫০০১৫৫৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞান প্রচারে নারীদের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া আহমাদ, আইডিঃ ২১৫০০১৫৫৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞান প্রচারে নারীদের ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ- উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মারিয়া আহমাদ

(স্বাক্ষর)

মারিয়া আহমাদ

আইডিঃ ২১৫০০১৫৫৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৬ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব	৬
নারী সাহাবিয়াদের ইলম অন্বেষণ	৮
নারীদের ইলম অন্বেষণের পদ্ধতি	১২
নারীদের হিফযে কুরআন, তাজবীদ ও তাফসীরের ইলম	১৪
নারীদের ফিকহ ও ফতোয়া	১৮
আলেমা, মুহাদ্দিসাদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা	২০
নারী মুহাদ্দিসদের দরসে ছাত্রদের ভীড়	২৩
সুফিবাদে নারীর ভূমিকা	২৭
নারীদের মাদরাসা -মক্তব প্রতিষ্ঠা	২৯
মক্কা মুকাররমায় পানির নালা তৈরী	৩২
রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম নারী	৩৩
মায়ের নামে প্রসিদ্ধ আলেমগণ	৩৪
সাহাবায়ে কেরামের যুগে নারীদের ইলমী অবদান	৩৬
উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা)	৩৮
উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা.	৪০
উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা	৪৩
উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবাহ রা.	৪৪
উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা.	৪৫
উম্মুল মুমিনিন হজরত জুয়াইরিয়্যাহ রা.	৪৫
হজরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রা	৪৭
হজরত ফাতেমাতুজ্জাহরা রা.	৪৮
হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.	৪৯
হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রা	৫১
হজরত উম্মে আয়মান রা.	৫৩
হজরত উম্মুল দারদা আল কুবরা রা.	৫৪
হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা.	৫৫
হজরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রা.	৫৬
হজরত উম্মে ফজল লুবাবাহ বিনতে হারেস হেলালী রা.	৫৭
হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা	৫৮
হজরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রা	৬০

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
উম্মে হারাম বিনতে মিলহান আনসারীয়্যাহ রা	৬২
প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগনের সফলতার পিছনে তাদের মায়েদের অবদান	৬৪
ইমাম মালেক রে.-এর আম্মা	৬৪
ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ.-এর আম্মা	৬৫
ইমাম আওযায়ি রহ এর আম্মা	৬৬
ইমাম ইবনে উলাইয়াহ রহ এর আম্মা	৬৭
ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জায রহ এর আম্মা	৬৯
ইমাম শাফেয়ী রহ এর আম্মা	৭০
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর আম্মা	৭১
ইমাম বুখারী রহ এর মা	৭৩
ইমাম আওকাস রহ -এর আম্মা	৭৫
খলিফা নাসের আব্বাসীর মা	৭৬
হজরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ এর আম্মা	৭৭
হজরত সায়্যিদ আহমেদ রায়বেরেলির রহ এর মা	৭৯
হজরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী রহ -এর আম্মা	৭৯
হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্দলভী রহ -এর মা	৮০
উম্মতের প্রসিদ্ধ আলেমা ও মুহাদ্দিসাগণ	৮১
উম্মে অমর বিনতে হাসসান বাগদাদি	৮২
যায়নাব বিনতে সুলাইমান বাগদাদি রহ	৮৩
খাদিজা উম্মে মোহাম্মদ বাগদাদি রহ	৮৩
বিশর হাফী রহ এর বোন	৮৪
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর স্ত্রী আবাসাহ	৮৪
ইব্রাহিম খাওয়াস এর বোন মাইমূনাহ	৮৫
হুজাইমা বিনতে হুয়াই রহ	৮৫
সায়্যিদা নাফিসা বিনতে আল হাসান	৮৮
ফাতিমা বিনতে আব্দুর রহমান হাররানিয়াহ রহ	৯০
তাজুন নিসা বিনতে রুস্তম বিন আবি রজা রহ.	৯০
কারিমা বিনতে মুহাম্মদ বিন হাতেম মারজিয়া রহ	৯২
আমরা বিনতে আব্দুর রহমান রহ	৯৪
হাফসা বিনতে সিরীন রহ	৯৬
হজরত আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ রহ	৯৮
আয়েশা বিনতে ইউসুফ বাউনিয়াহ রহ	১০০
পরিসমাপ্তি	১০২

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

মহান আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এই জন্য যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে' (সূরা জারিয়াত, আয়াত -৫৬)।

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার' (সূরা বাকারা: আয়াত-২১)।

সেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহপাক একটি শর্ত যুক্ত করেছেন। সেই শর্তটি হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান। ইলম বা জ্ঞান ব্যতীত কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য ইবাদত করার পূর্বে এ সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করা সকলের উপর ফরজ। শিক্ষা লাভ করা থেকে নর-নারী কাউকে বাদ দেয়া যাবে না। কেউ বিরত থাকতে পারবে না। আল্লাহপাক পুরুষকে যেমন শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন তেমন নারীকেও শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বিধানে শিক্ষা অর্জন করা নর-নারীর সমান অধিকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কোরআন নাজিল করে মহান আল্লাহপাক সর্ব প্রথম যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দেশটাই হচ্ছে নর-নারীর জন্য শিক্ষা বিষয়ক। ইরশাদ হচ্ছে-اقرا।'পড় তোমার প্রভুর নামে'' (সূরা আলাক: আয়াত-১)।

শিক্ষা ছাড়া আল্লাহকে জানা বুঝা যাবে না বিধায় শিক্ষা অর্জন করা প্রথম ও প্রধান ফরজ। এই ফরজ কাজ থেকে বিরত থাকা মানেই সকল ক্ষেত্রে ধ্বংস ডেকে আনা। মানবতার ইহ-পরকালীন শান্তির একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষা। ইলমে দীন অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য আবশ্যকীয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন –

طلب العلم فريضة علي كل مسلم

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।(সুনানে ইবনে মাজাহ)

তবে শিক্ষা নারীদের উপযোগী করে দেওয়ার বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ নারীর জ্ঞান বুদ্ধি, শক্তি -সামর্থ,প্রয়োজন ও চাহিদা পুরুষ থেকে ভিন্ন। নারীত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা প্রকৃতিগত,সেইদিকে লক্ষ্য রাখাও মানবিকতার বিষয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা সাহাবিদেরকে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা দিতেন এবং এই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন।

কোরআন হাদীস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব, নবী সা. সর্ব প্রথম নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এই শিক্ষার বিধান সর্ব প্রথম বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ পান রাসুলে পাক সা. এর প্রিয় সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা.। কাজেই নারী শিক্ষার বিষয়টাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। অগণিত হাদীস দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট প্রমাণিত- নবী সা. নিজেই নারীদেরকে শিক্ষাদান করতেন, নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতেন। সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন এমনকি বড় বড় সাহবীগণও নারীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম রা. বর্ণিত হাদীসে আছে- ‘একবার এক মহিলা রাসূল সা. এর দরবারে এসে কিছু বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করলো। বিদায় নিয়ে যাবার সময় রাসূল সা. তাকে বললেন আর জানার মত কিছু থাকলে অন্য সময় জেনে নিও। মহিলাটি আরজ করলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনাকে না পাই অর্থাৎ যদি আপনি দুনিয়াতে না থাকেন তখন কি হবে? রাসূল সা. বললেন- আবু বকর রা. এর নিকট তখন শিক্ষা গ্রহণ করিও’ (বুখারী ও মুসলিম, তিরমিজী)।

উক্ত হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত- নবী সা. স্বয়ং নিজে নারীদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্য জনের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য

নারীদেরকে উৎসাহিত করতেন। রাসূল সা. এর যুগে এবং পরবর্তী সময়ে অগণিত মহিয়সী মুসলিম নারী শিক্ষাদান করেছেন এবং তারা শিক্ষকতা করে নিরক্ষরতা দূর করেছেন।

শিক্ষা অর্জন করা একটি ফরজ কাজ এবং এর চেয়ে বড় ফরজ হল পর্দা রক্ষা করা। পুরুষের মত নারীরাও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে, শিক্ষকতা করবে এবং শিক্ষার প্রসার করবে এ সম্পর্কিত নির্দেশ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- 'হে নবী পরিবার! তোমাদের গৃহে যে আল্লাহর বাণী পাঠ করা হয় এবং হিকমত পরিবেশন করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর এবং প্রচার কর' (সূরা আহযাব: আয়াত-৩৪)।

তথ্যসূত্র :ইসলামে নারীর ইলমী অবদান, দৈনিক ইনকিলাব

নারী সাহাবিয়াদের ইলম অন্বেষণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি মহিলাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেন,

﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤ ﴾ [الاحزاب: ٣٤]

"আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকতম পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্খা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ

نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعنهن الحياء ان يتفقهن في الدين

"আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।"

হজরত আবু সাইদ খুদরি রা থেকে বর্ণিত আছে যে,একবার মহিলা সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

غلبنا عليك الرجال،فاجعل لنا يوما من نفسك،فوعدهن يوما لقيهن فيه،فوعظهن و امرهن،فكان فيما قال لهن :ما منكن امراة تقدم ثلاثة من ولدها،الا كان لها حجابا من النار فقالت امراة : و اثنتين؟فقال: واثنتين

(আপনার থেকে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে) পুরুষরা আমাদেরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য্য করুন।তখন তিনি তাদের সামনে ওয়াজ নসিহতের জন্য একটি আলাদা দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাদেরকে ওয়াজ নসিহত করলেন। তিনি তাদের যা বলেছিলেন তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই যে,যে মহিলার তিনটি সন্তান গত হয়েছে সেই মহিলার সন্তানগুলো জাহান্নাম থেকে তার বাঁচার ঢাল হবে।এটা শুনে এক মহিলা বলে উঠলো কারো যদি দুই সন্তান মারা গিয়ে থাকে? তিনি বললেন, দুইজন হলেও।(সহীহ বুখারী,কিতাবুল ইলম)

হজরত আসমা বিনতে সাকান আনসারী রা অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও পরহেজগার সাহাবী ছিলেন। নারী সাহাবীরা তাকে নিজেদের প্রতিনিধি করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পাঠালেন।তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন, আমি মুসলিম মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। তাদের পক্ষ থেকে বলছি এবং এটা আমার নিজেরও কথা –

আপনাকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মাঝে নবী করে পাঠানো হয়েছে।আমরা নারীরাও আপনার উপর ইমান এনেছি।আপনার অনুসরণ করছি। আমরা পর্দার বিধান পালন করে অন্দরমহলে থাকি।পুরুষদের সকল প্রয়োজন পুর্ণ করি।তাদের সন্তানদের লালন পালন করি।এদিকে পুরুষরা মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার সুযোগ পাচ্ছে। জানাজার নামাজে শামিল হতে পারছে এবং জিহাদে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছে।এগুলো করে তারা অতিরিক্ত অনেক সওয়াব লাভ করছে। অথচ তারা যখন জিহাদে যায় তখন আমরা তাদের সম্পদ ও সন্তানদের হিফাজত করছি।হে আল্লাহর রাসুল! এই অবস্থায় আমরাও কি পুরুষদের সেইসব সওয়াবের অংশীদার হবো?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা এর এই হৃদয়াগ্রাহী বক্তব্য শুনে সাহাবাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি আর কোনো নারীকে আসমা বিনতে ইয়াযিদের মতো এমন সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ?সাহাবীরা বললেন, না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন,যাও ঐসব নারীদের বলে দাও যে,

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করে, স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং তাকে মেনে চলে, তাহলে পুরুষদের ব্যাপারে তুমি যা যা উল্লেখ করলে সে ঐ সকল ব্যাপারে পুরুষদের সমান(সওয়াব পাবে)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে এই সুসংবাদ শুনে হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা খুশিতে তাকবির বলতে বলতে চলে গেলেন। এবং অন্য সবাইকে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেওয়া সুসংবাদ শুনালেন।(আল ইসতিআব,খ:২,পৃ:৭২৬)

এই ঘটনাগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে, মহিলা সাহাবীদের মাঝে ইলমেদীন অর্জনের কী পরিমাণ গুরুত্ব ও আগ্রহ ছিলাম। তারা এজন্য একত্রিত হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আবেদন জানাতেন। এবং তিনিও তাদের আবেদন গ্রহণ করতেন, তালীম দিতেন।

মহিলা সাহাবিদের কোনো মাসয়ালা মাসায়েল জানার প্রয়োজন হলে কিংবা কোনো বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনে নিতেন।কেউ কেউ হজরত আয়েশা রা ও হজরত উম্মে সালামা রা এর মাধ্যমে জেনে নিতেন। আবার বয়োবৃদ্ধ ও আত্মিয় মহিলাগণ সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন।

পুরুষ সাহাবিদের মতো মহিলা সাহাবিদের মাঝেও আলেম,ফাযেল,ফকিহ,মুহাদ্দিস ও দীনি ইলমে বুৎপত্তি লাভকারী অনেক মহিলা ছিলেন। হজরত আয়েশা রা ফকিহুল উম্মত ছিলেন। হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর পালিত কন্যা।তার সম্পর্কে আছে যে,

و كانت من افقه نسلء اهل زمانها

তিনি তার সময়ের নারীদের মাঝে সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন।

এইসব নারী সাহাবিদের অনুসরণ করে পরবর্তী যুগের মুসলিম নারীরাও ব্যাপকভাবে হাদিস, ফিকাহ,কবিতা, সাহিত্যসহ বহুবিধ জ্ঞানার্জনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বড় বড় অবদান রেখেছেন। ঘরের ভেতরে, বাইরে, সর্বক্ষেত্রে, যুগে যুগে নিজেদের নাম ও কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নারীদের ইলম অন্বেষণের পদ্ধতি

ইলমে দীন অর্জন করা পুরুষদের জন্য যেমন ফরজ তেমনি নারীদের জন্য ও আবশ্যকীয়। কিন্তু ইলম অন্বেষণের পদ্ধতি নারী এবং পুরুষের জন্য আলাদা। ইসলামি ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ছাত্রী এবং মুহাদ্দিসাদের জন্য শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের দরবারে শিক্ষালয়ে পৃথক জায়গা থাকতো,যেখানে বসে পুরুষদের থেকে সম্পুর্ন আলাদাভাবে পর্দার সাথে তারা দরস শুনতেন।

মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম অংশের মহিলা আলেম ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে হজরত উম্মে হানি আবুসিয়্যাহ রহ ও তার বোন ফাতেমা আবুসিয়্যাহ রহ সেখানকার একটি ইলমি পরিবারের সদস্য ছিলেন। এবং তারা উভয়েই ফকিহ ও মুফতী ছিলেন। তাদের সাথে শায়েখ যাওরাক রহ এর দাদী উম্মে বানীন রহ ও আরো অনেক আলেম ও মুহাদ্দিস মহিলা শায়েখ আবদস রহ -এর হাদিসের দরসে অংশগ্রহণ করতেন। এবং কুরাবিয়্যিনের অন্যান্য মাশায়েখদের মতো তার শিক্ষালয়েও মহিলাদের বসার জায়গা ছিলো। ঐতিহাসিকগণ বলেন –

“এইসব সম্মানিত মহিলাগণ এমন জায়গায় বসে পাটগ্রহন করতেন, যে জায়গা আলাদাভাবে শুধু তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকতো।আর কুরাবিয়্যিন শহরে এমন পৃথক ব্যবস্থা অনেক ছিলো যেখানে বসে মহিলাগণ বড় বড় শায়েখ মুহাদ্দিসদের থেকে সহজেই পাঠ শুনতে পেতেন এবং পুরুষরা যে পাঠ শুনতেন , মহিলারাও তা পুরাপুরি শুনতেন।”

এ থেকে এটাও জানা যায় যে, কুরাবিয়্যিন শহরে ছাত্র ছাত্রীদের এমন পৃথক পাঠকক্ষের ব্যবস্থা বেশ ব্যপক ছিল।

মহিলা মুহাদ্দিসগণ ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ঘরে বা সফরে যেভাবে শরয়ী বিধানের করেছেন,তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের পরিপূর্ণ খেয়াল রেখে শরীয়ত ও নারীত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেছেন,তেমনি হাদিসের পাঠদান ও বর্ণনার ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীলতার পরিচয়

দিয়েছেন। কোনো অবস্থাতেই তাদের সীমা অতিক্রম করেননি। বিশেষ করে পর্দার দিকে তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত কঠোর। ছিলো।

আসেম ইবনে সুলাইমান আল আহওয়াল রহ বলেন, আমরা যখন হাফসা বিনতে শীরিন রহ -এর খেদমতে যেতাম তখন তিনি নিজের চাদরকে আরো ঠিকঠাক করে চেহারায় নিকাব ফেলে দিতেন।আমরা তাকে বলতাম আপনি এই কষ্ট কেন করছেন?আপনার মতো বয়োবৃদ্ধাদের সম্পর্কে তো আল্লাহ তায়ালা বলেই দিয়েছেন –

و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة

যে বৃদ্ধা নারীদের বিবাহের কোনো আশা নেই তাদের জন্য এতে কোনো গুনাহ নেই যে,তারা নিজেদের (বাড়তি) কাপড় (বহির্বাস,গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে) খুলে রাখবে,সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে। (সুরা নুর:৬০)

তখন তিনি বলতেন আয়াতে এরপর কী বলা হয়েছে?তখন আমরা পরের অংশটুকু তেলাওয়াত করতাম-و ان يستعففن خير لهن

"আর যদি তারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাহলে সেটাই তাদের জন্য শ্রেয়।" এ কথার পর তিনি বলতেন, আমার চাদর মুড়ি দেওয়ার বিষয়টি ও ঠিক তাই।

অনেক মহিলা আলেম,ফাযেল শরিয়তে পর্দার বিষয়ে যতটুকু ছাড় রয়েছে ততটুকু ছাড় গ্রহণ করে সরাসরি আলেম উলামাদের সামনে যেতেন।এবং ইলমি ও দীনি বিষয়ে আলোচনা করতেন। যেমন –

উলাইয়াহ বিনতে হাসান বসরী রহ বনু শায়বান এর দাসী ছিলেন। তিনি ইলমের ক্ষেত্রে এতো উঁচু মর্যাদা অর্জন করেছিলেন যে, বসরার উলামা,ফুকাহা ও মাশায়েখ তার কাছে আসতেন এবং তিনি তাদের সামনে গিয়ে কথা বলতেন।তবাকাতে ইবনে সাআদ এ আছে- উলাইয়াহ বিনতে হাসান বসরি রহ অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। বসরার আওয়াকাহ নামক স্থানে তার বাড়ি ছিলো এবং সেটা তার নামেই প্রসিদ্ধ ছিলো।

বসরার মান্যবর ব্যক্তিত্ব ও ফকিহগণ তার ওখানে যেতেন।তিনি তাদের সামনে এসে তাদের সাথে আলোচনা ও বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর করতেন।

মহিলা মুহাদ্দিসগণ শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে উস্তাজ ও শায়েখের কাছ থেকে হাদিস শুনে,শুনিয়ে কিংবা সরাসরি বা পত্রমাধ্যম অনুমতি লাভ করে যেভাবে হাদিস অন্বেষণ করেছেন সেভাবে নিজেরাও দরস দিয়েছেন, হাদিস বর্ণনা করেছেন। যার কারণে হাফেযে হাদিস ও আইম্মায়ে হাদিসগণ তাদের থেকেও হাদিস শুনে, শুনিয়ে কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে উপকৃত হয়েছেন।

নারীদের হিফযে কুরআন, তাজবীদ ও তাফসীরের ইলম

এই নারী মুহাদ্দিস ও আলেমদের মধ্যে অনেকে কুরআনের হাফেয, কারী ও মুফাসসির ছিলেন। যারা ইলমে হাদিসের মতো কুরআনের খেদমতেও বড় বড় কীর্তি রেখে গেছেন।

হাফসা বিনতে শীরিন বারো বছর বয়সেই কুরআনে কারীমের অর্থ ও ব্যাখাসহ হেফয করে ফেলেন। তিনি তাজবীদ ও ইলমে কেরাতের বিষয়েও দক্ষতা রাখতেন।হিশাম নামের একজন বর্ণনাকারী বলেন, যখন তার ভাই মুহাম্মদ ইবনে শিরীন এর কোনো শাগরেদ ইলমে কেরাতের বিষয়ে কোনো সমস্যায় পড়তেন তখন তিনি তাকে বলতেন, যাও হাফসাকে জিজ্ঞেস করো; সে এটা কিভাবে পড়ে? হাফসা প্রতি রাতে অর্ধেক কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (সিফাতুস সফওয়াহ,খ:৪, পৃ:১৬)

ফাতেমা নিশাপুরী প্রসিদ্ধ মুফাসসির ছিলেন। তিনি কুরআন বোঝার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। ইবনে মুলুক নামের একজন বুজুর্গ তার সম্পর্কে বলেছেন যে,আমি তার মতো বুজুর্গ মহিলা আর দেখিনি।একদিন আমি তার জ্ঞান সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে হজরত যুননুন মিসরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এই মহিলা কে?তিনি উত্তরে বললেন, ইনি আল্লাহ তায়ালার একজন প্রিয় ওলী এবং আমার শিক্ষিকা।(সিফাতুস সফওয়াহ, খ:৪,পৃ:১০১)

আমাতুল ওয়াহিদ বিনতে মাহামিলী রহ একজন আলেমা, ফাযেলা, ফকীহা ও মুফতীয়াহ হওয়ার পাশাপাশি একজন হাফেজায়ে কুরআনও ছিলেন।

ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদিসী রহ -এর বোন আসিয়া তার যুগের একজন অদ্বিতীয়া আবেদা, যাহেদা ও হাফেজায়ে কুরআন ছিলেন। এমনিভাবে তার স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুহাম্মদ ইবনে খালাফ মাকদাসিয়্যাহ কুরআনের আলেমা ছিলেন। উলূমে কুরআনের উপর তার দক্ষতার প্রসিদ্ধ ছিলো।ইলমে তাজবিদ ও ইলমে কেরাত সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ রাখতেন। (হাশিয়াতওল ইকমাল, খ:২,পৃ:৯২)

ইমাম যাইনুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইব্রাহিম কারী দিমাশকী মিসরী রহ

অনেক বড় মাপের ফকীহ, মুফাসসির ও ওয়ায়েজ ছিলেন। তার এইসব গুণ অর্জিত হয়েছিল তার মায়ের দোয়ার বরকতে। নাসেহউদ্দিন নামে একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে,ইমাম যাইনুদ্দিন রহ বলেন,

انا اسعد بدعاء والدةي، كانت صالحة حافظة، تعرف التفسير

আমি আমার মায়ের দোয়ার বরকতে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি।আমার মা বড়ই নেককার, কুরআনের হাফেজা ও মুফাসসিরা ছিলেন। (শাযারাতুয যাহাব, খ:৬,পৃ:৫৫৫)

ইমাম যায়নুদ্দিন রহ বলেন, আমি যখন আমার মামা শারাফুল ইসলাম আব্দুল ওয়াহহাব রহ থেকে তাফসিরের দরস গ্রহণ করে আমার মায়ের কাছে যেতাম তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আজ আমার ভাই কি তাফসির করলেন? উত্তরে আমি যখন বলতাম যে, অমুক অমুক সুরা থেকে তাফসির করেছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, অমুকের মন্তব্য নকল করেছেন কি? অমুক আলোচনা তিনি করেছেন কি?আমি যখন বলতাম যে, করেননি।তখন তিনি নিজেই সেসব আলোচনা করে বলতেন এই এই জায়গাগুলো সে ছেড়ে দিয়েছে।তার অবস্থা এই ছিলো যে,

كانت تحفظ كتاب "الجواهر" و هو ثلاثون مجلد،تاليف والدها الشيخ ابي الفرج،و اقعدت اربعين سنت في محرابها

তিনি তার পিতার লিখিত ত্রিশ খন্ডের তাফসীর গ্রন্থ আল জাওয়াহের মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তিনি একাধারে চল্লিশ বছর নিজের নিভৃত কক্ষে ইবাদতে কাটিয়েছেন। (তাবাকাতুল হানাবেলাহ, খ:১, পৃ:৪৪০)

তবাকাতুল মুফাসসিরীন গ্রন্থে ঘটনাটি এভাবে লিখা হয়েছে, শাইখুল ইসলাম ইমাম আবুল ফারায আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে মুহাম্মদ শিরাজী মাকদিসী রহ কিতাবুল জাওয়াহের নামে ত্রিশ খন্ডের কুরআন তাফসীরের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ পুরো তার কন্যার মুখস্থ ছিলো।

ইমাম আবু মুহাম্মদ সিরাজুদ্দীন আব্দুর রহমান ওমর হাররানী হাম্বলী রহ -এর সন্তানদের মাঝে একজন অন্ধ মেয়ে ছিলো। তার মুখস্থশক্তির প্রখরতা সে যুগে আশ্চর্যের বিষয় হিসাবে পরিচিত ছিলো। তবাকাতে হানাবেলায় আছে যে,

و كانت له بنت عمياء تحفظ كثيرا اذا سءلت عن باب من العلم من الكتب الستة ذكرة اكثره و كانت اعجوبة في ذلك

তার একটি অন্ধ মেয়ে ছিলো। অনেক কিছু তার মুখস্থ ছিলো। সিহাহ সিত্তার যে কোনে অধ্যায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাথে সাথে সে অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদিস বলে দিতেন। মুখস্থ শক্তিতে তিনি একজন বিস্ময়কর নারী ছিলেন। (তাবাকাতুল হানাবেলা)

আয়েশা আবদুর রহমান মিসরের দিময়াত শহরে ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা ছিলেন আল আজহারের শিক্ষক। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শেষ করেন আয়েশা আবদুর রহমান। ১৯৫০ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তাফসিরশাস্ত্রে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। রচনা করেন বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ। বলা যায়, তিনি আধুনিক যুগের প্রথম সারির নারী তাফসিরবিদ ও ইসলামী নারী স্কলার। তাঁর উল্লেখযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ হলো দুই খণ্ডের ‘আত তাফসিরুল বায়নি লিল কুরআনিল কারিম’। এটি ৩০তম পারার বিশেষ কিছু সুরার তাফসির। এ ছাড়া তাসফির ও কোরআনি সায়েন্স বিষয়ে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯১৮ সালে মিসরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন আল আজহারের শিক্ষক। শৈশবেই তিনি তাঁর পিতাকে হারান। মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। তিনি তাফসির, ফিকহ, হাদিসসহ অন্যান্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। তাফসরিশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। এই শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো দুই খণ্ডের 'নাজরাতুন ফি কিতাবিল্লাহ'। প্রথম খণ্ডে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা ইবরাহিম পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে সুরা হিজর থেকে সুরা নাস পর্যন্ত। তিনি এই তাফসির রচনাকালে জগদ্বিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছেন। জয়নব গাজালির এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি শিক্ষা ও প্যারেন্টিং বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। (জুহুদুল মারআ আল মুআসিরা ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম, পৃষ্ঠা ১০)

ফাওকিয়া ইবরাহিম আশ শিরবিনি মিসরের একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার। আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি শায়খ শারাউয়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মসজিদভিত্তিক বিভিন্ন মজলিসে তিনি নারীদের তাফসিরের দরস দিতেন। তিনি সহজ-সরলভাবে কোরআনের তাফসির করতেন। তাফসির জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো চার খণ্ডের 'তাইসিরুত তাফসির'। প্রায় সাত বছর সময় ও শ্রম ব্যয় করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

ফাতেমা কারিমান ১৯৪২ সালে মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন ফাতেমা কারিমান। সাংবাদিকতার ওপর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতা করেন। এর পাশাপাশি তিনি টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপিকা হিসেবেও কাজ করেন। বিভিন্ন দাওয়াতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুবাদে তৎকালীন মিসরের বড় বড় আলেমদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং দ্বিনের পথে ধাবিত হন। 'আল-লুলু ওয়াল মারজান ফি তাফসিরিল কোরআন' নামক তিন খণ্ডের একটি তাফসিরগ্রন্থ রচনা করেন তিনি।

নারীদের ফিকহ ও ফতোয়া

এইসমস্ত নারী মুহাদ্দিসা ও আলেমাদের মধ্যে অনেক ফকীহা ও মুফতীয়াহ ছিলেন।কুরআন, হাদীসের সাথে ফিকহ ফতোয়ার ক্ষেত্রে বড়ই পূর্ণতার অধিকারীনী ছিলেন। এরা ফকীহা ও মুফতীয়াদের হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলিম উম্মাহ তাদের ফতোয়া পরিপূর্ণ আস্থার সাথেই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহ এর বক্তব্য অনুসারে মহিলা সাহাবীদের মাঝে অন্তত বাইশজন ফকীহা ও মুফতীয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যাদের মাঝে নবীজীর সম্মানিতা স্ত্রীগণও আছেন।এদের মাঝে হজরত আয়েশা রা ফকিহুল উম্মাহ তথা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকিহা-র উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. তার "ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ফতোয়া দেয়ার শর্তাবলীর আলোচনায় যোগ্যতাকেই মূল মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। নারী-পুরুষ ও স্বাধীন-গোলাম কারো সাথেই নির্দিষ্ট করে দেননি।

ইবনুল কায়্যিমের মতে রাসূলের প্রায় একশ পচিশ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন ফতোয়া সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন আয়েশা রা.-সহ নারী ফতোয়া প্রদানকারী প্রায় ২২ জন।

প্রথম শতাব্দীতে নারীদের ফতোয়ার চর্চা বেশ লক্ষ্যণীয় ছিল। আয়েশা রা.-কে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাতজনের একজন গণ্য করা হয়। ইমাম যাহাবীর মতে তিনি সকল যুগের সেরা নারী ফকীহ। আবু বকর, উমর ও উসমানের খেলাফতের সময় তিনি ফতোয়া দিতেন।

আয়েশা রা. শুধু ফতোয়া ও হাদীস বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং বিভিন্ন সাহাবীর সাথে ইলমি আলোচনা করেছেন। তাদের দেয়া বিভিন্ন ফতোয়ার ওপর সংশোধনী দিয়েছেন। তিনি এমন অনেক ফতোয়া দিয়েছেন, যা শুধু তার মাধ্যমেই প্রমাণিত। তার হাত ধরেই পরবর্তীতে ফতোয়া প্রদানের যোগ্য নারী ইসলামে অবদান

রেখেছেন। যেমন- আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান, যিনি তার পরে ফতোয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। সাফিয়্যাহ বিনতে শায়বাহ ও উম্মে দারদা।

যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা এর বক্তব্য অনুসারে 'তাফাক্কুহ' এতো উঁচু স্তরের ছিলো যে,বিখ্যাত তাবেয়ী আবু রাফে রহ যখনই মদিনা মুনাওয়ারার কোনো ফকিহের কথা স্মরণ করতেন তখন যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা এর কথা সবার আগে স্মরণ করতেন।

ইতিহাসের সব যুগে পৃথিবীর সব অঞ্চলেই নারী মুফতি ছিল। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে তিউনিসিয়ার কারওয়াইনের বিখ্যাত দুই জন নারী আলেম ছিলেন। আসমা বিনতে আসাদ (২৫০); তিনি ইলমি বিভিন্ন বিতর্কে অংশ নিতেন। তার প্রশ্নোত্তর মজলিস অনুষ্ঠিত হত। তার পিতা মালিকি মাযহাবের বড় ইমাম হওয়া সত্বেও তিনি ফিকহে হানাফি অনুসরণ করতেন। দ্বিতীয়জন মালিকি মাযহাবের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সুহনুনের মেয়ে খাদিজা (২৭০)।

ঠিক একই সময়ে মিসরে ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের পুরোধা ইমাম মুযানীর বোন (২৬৪); যিনি শুধু মুযানীর বোন নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ইমাম শাফেয়ি থেকে ইলম অর্জন করেন। খোদ মুযানীর সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক করতেন।

আন্দালুসে ফাতেমা বিনতে ইয়াহইয়াহ (৩১৯) আলেম, ফকীহ ও মুত্তাকী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার জানাযায় যত মানুষ অংশ নিয়েছিল, কোন নারীর জানাযায় এমন দেখা যায়নি।

ইরাকে উম্মে ঈসা (৩২৮) ফতোয়া প্রদান করতেন। কাযী হুসাইনের মেয়ে (৩৭৭) শাফেয়ি মাযহাবের পাণ্ডিতব অর্জন করে পিতার সাথে ফতোয়ার কাজ করতেন। খোরাসানে আয়েশা বিনতে আহমাদ (৫২৯) ফিকহের চর্চা করতেন। ফতোয়া দিতেন। একই শতাব্দীতে ইরাকে শাহদাহ বিনতে আহমাদ (৫৭৪) উলুমে ইসলামিয়াতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষত ফিকহে। তিনি পর্দার ওপাশ থেকে নারীদের পাঠদান করতেন। তার নিকট অনেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তুহফাতুল ফুকাহা-র লেখক হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ও আলেম শায়েখ আলাউদ্দিন সমরকান্দি রহ এর কন্যা ফাতেমা ছিলেন একজন বড় মাপের ফকিহা।তার স্বামী ছিলেন আলাউদ্দিন কাসানী রহ।তইনি তুহফাতুল ফুকাহা-র একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন আল বাদাইউস সানাইউ নামে। ফাতেমা সম্পর্কে কিতাবে লিখা আছে যে, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখার সময় কোথাও যদি স্বামীর ভুল হয়ে যেতো তাহলে ফাতেমা সংশোধন করে দিতেন। ফাতেমা পিতা ও স্বামীর সাথে ফতোয়া লেখার কাজও করতেন। এ সম্পর্কে কিতাবে আছে –

ان الفتوي كانت تخرج من بيتها و عليها خطها وخط ابيها و زوجها

বিভিন্ন ফতোয়ার উপর ফাতেমা, তার পিতা ও স্বামী তিনজনেরই স্বাক্ষর থাকতো। (আল জাওয়াহেরুল মুদিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, খ:২, পৃ:২৭৭)

ফকিহা মুফতিয়্যাহ উম্মে হানী উয়ূসিয়াহ,তার বোন ফাতেমা ও শায়েখ যাওজাক রহ -এর দাদী ফকিহা উম্মে বানীন রহ এই তিনজন ফকিহা-মুফতিয়াই মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমা অঞ্চলে ফিকহ,ফতোয়ার বিষয়ে আলাদাভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আলেমা, মুহাদ্দিসাদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা

এই আলেমা, ফাযেলাদের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনে ওলামায়ে ইসলাম অনেক বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাদেরকে বড় বড় উপাধি দিয়েছেন।তাদের সামনে শ্রদ্ধায় নত হতে দ্বিধাবোধ করেন নি।তাদের থেকে উপকৃত হতে পিছপা হননি।

উম্মে মুহাম্মদ খাদিজা বাগদাদিয়াহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর মজলিসে যেতেন।ইমাম সাহেব তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। ইমাম সাহেবের পুত্র লিখেন,

و كانت تجيء الي ابي تسمع منه و يحدثها

তিনি আমার পিতার কাছে আসতেন এবং তার থেকে হাদিস শ্রবণ করতেন।পিতাজী ও তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন।(তারীখে বাগদাদ, খ:১৪, পৃ:৪৩৫)

প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদিস ইবনে উলাইয়াহ রহ এর মা উলাইয়াহ বিনতে হাসান রহ এর কাছে বসরার উলামা ও ফুকাহাগন আসতেন এবং তার সাথে ইলমী ও দীনি বিষয়ে আলোচনা করতেন।

হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত কিতাব সহিহ বুখারির দরসদানকারী প্রথম নারী কারিমা বিনতে আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাতেম মারজিয়া (রহ.)। তিনি ছিলেন উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, হাদিসের সনদের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমা এবং বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী। ইসলাম ও ইলমের খেদমতে তাঁর বিরাট অবদানের কারণে পরবর্তী আলেমগণ তাঁকে উম্মুল কিরাম উপাধিতে ভূষিত করেন।

আতিকা বিনতে ইয়াজিদ (রহ.) ছিলেন সময়ের খ্যাতিমান নারী মুহাদ্দিস ও উমাইয়া বংশের গর্ব। হাদিস গবেষকরা তাঁকে ‘তৃতীয় স্তরের মুহাদ্দিস বা হাদিস বর্ণনাকারী’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.)-এর নাতি, খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের স্ত্রী এবং খলিফা ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিকের মা।

আতিকা বিনতে ইয়াজিদ (রহ.) একজন নারী মুহাদ্দিস হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছেন। বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও হাদিস বিশারদ আবু জুরআ (রহ.) বলেন, ‘শামের যেসব নারী হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আতিকা বিনতে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া (রা.) অন্যতম। তাঁর থেকে আমর ইবন মুহাজির আল-আনসারি (রহ.)-এর মতো মুহাদ্দিসও হাদিস বর্ণনা করেছেন।

মুসলিম নারীদের মর্যাদা, মহত্ব, বড়ত্ব ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি তাদের খেলাফত প্রদানের মাধ্যমেও হয়েছে।মশায়েখগন তাদের থেকে ইহসান ও তাসাউফের খেলাফত গ্রহণ করেছেন। আমাতুর রহমান ফাতেমা বিনতে কুতুবউদ্দিন মক্কীয়্যাহ জামালিয়্যাহ শায়েখ নাজিমুদ্দিন তাবরেযী থেকে খেলাফত লাভ করেন। তিনি নেতৃত্বস্থানীয়দের বড় একটি জামাতকে হাদীসের দরস দিয়ে তাদেরকে সনদ প্রদান করেন।(আল ইকদুস সামীন ফী তারীখিল বালাদিল আমীন, খ:৮, পৃ:২৮৮)।

হাফসা বিনতে সীরিন রহ -এর বুযুর্গীর বর্ণনা ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া রহ এভাবে দিয়েছেন, ما ادركت احدا افضله علي حفصة আমি তার মতো বুযুর্গ আর কাউকে দেখিনি। (তাহযীবুত তাহযীব, খ:১২, পৃ:৪০৯)

বাগদাদের বিশিষ্ট আলেমরা শায়েখাহ উম্মে ফাতাহ আমাতুস সালাম বিনতে কাজী আবু বকর আহমদ ইবনে কামেল বাগদাদী রহ -এর ইলম, ফযল ও দীনদারীর স্বীকৃতি দিতেন।ইবনুল জাওযী রহ লিখেন,

سمعت الازهاري، والتنوخي و ذكر امة الاسلام بنت احمد القاضي،فاثنيا عليها حسنا و وصفاها بالديانة و العقل و الفضل

আমি ইমাম আযহারী ও ইমাম তানুখীকে আমাতুস সালাম বিনতে আহমদ আল কাজির প্রশংসা করতে শুনেছি এবং তার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও আমানতদারীর কথা বলতে শুনেছি। (আল মুনতাজাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, খ:১৫, পৃ:২৫)

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আযীয ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাইসাম এর প্রিয় শাগরেদদের একজন ছিলেন। শায়েখ নিজের কন্যা উম্মে কুলসুমের বিবাহ শাগরেদের সাথে দিয়ে দেন।এবং তারা স্বামী স্ত্রী দুজনেই সে যুগে ইলম ও ফযলে একক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। জীবনীকার লিখেন-

و كانت عالمة زمانها،و هذا من افاضل زمانه

উম্মে কুলসুম তার সময়ের প্রসিদ্ধ আলেমা ছিলেন, তার স্বামীও ছিলেন বড় বড় আলেমদের একজন। (তবাকাতুল মুফাসসিরীন, খ:২, পৃ:৩৫৫)

এইসব খাদেমাহে ইসলামদের গ্রহণযোগ্যতা ও তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বোঝা যেত যখন তারা ইন্তেকাল করতেন।এবং সাধারণ মানুষ ও আলেমরা তাদেরকে নিজেদের অভিভাবকের মতো বিদায় জানাতেন এবং জানাযায় মানুষের ভীড় উপচে পড়তো।

বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসা ফাতিমা বিনতে নসর রহ -এর জানাযাতে এতো বেশি মানুষ হয়েছিল যে,ভীড়ের কারণে জামেউল কসরের গেট খুলে দিতে হয়েছিল।

আশেপাশের সকল বাজার ঘাট,সড়ক মহাসড়ক লোকে লোকারন্য হয়ে পড়েছিল। ঈদের দিনের থেকেও বেশি ভীড় হয়েছিল। বাগদাদের নেত্রীস্থানীয়রা জানাযার সাথে মাকবারায়ে ইমাম আহমদ পর্যন্ত গিয়েছেন।জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন তার ভাই।তার পিতার পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

উন্দুলুসের মুহাদ্দিসা, ফকিহা নারী ফাতেমা বিনতে ইয়াহইয়া রহ কুরতুবায় ইন্তেকাল করেন এবং রবায নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযা সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, এতো লোক আর কোনো মহিলার জানাযায় দেখা যায়নি।তার জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন মোহাম্মদ ইবনে আবু যায়েদ।

নারী মুহাদ্দিসদের দরসে ছাত্রদের ভীড়

নারী মুহাদ্দিস ও শায়েখদের দরসে দুরদুরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে হাজির হতো। এবং তাদের থেকে হাদিস অন্বেষণ করতেন এবং তাদের কাছ থেকে হাদিস বর্ণনার অনুমতিও লাভ করতেন ।তাদের দরসেও শুধু ছাত্রী এ নয় বরং হাদিসের ইমাম ও হাফেজগণও উপস্থিত হয়ে উপকৃত হতেন।

শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তিনি ‘তাঁর সময়ের মুসনিদা’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন।

অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের 'মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

পরিব্রাজক ইবনে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে'য়ীর 'রিসালাহ্' গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।

উম্মে মোহাম্মদ ইবনে যায়নাব বিনতে আহমদ ইবনে ওমর মাকদিসিয়্যাহ রহ নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত হাদিসের দরস প্রদান করেছেন। তার দরসে বিভিন্ন দেশের হাদিস অন্বেষণকারীরা উপস্থিত হয়ে হাদিসের সনদ লাভ করতেন। তিনিও অনেক অঞ্চলে গিয়ে হাদিসের দরস দিয়েছেন। ইমাম যাহাবী রহ তার জীবনীতে লিখেছেন যে-

و ارتحل اليها الطلبة.و حدثت بمصر ،و بالمدينة النبوية

ইলম অন্বেষণকারীগন তার কাছে যেতেন।তিনি নিজেও মিসর ও মদিনায় গিয়ে হাদিসের দরস দিয়েছেন।

ফখরুন্নিসা শুহদা বিনতে আবু নসার আহমদ ইবনে ফারাজ ইবনে ওমর আল ইবরী বাগদাদিয়াহ রহ প্রায় একশত বছর বেঁচে ছিলেন। উচ্চতম সনদে অনেক হাদিস তার সংগ্রহে ছিলো। এ জন্য বড় বড় আইম্মায়ে হাদিস তার থেকে হাদিসের সনদ নিতেন। ইবনে খাল্লিকান রহ লিখেন-

و كان لها المساع العالي الحقة فيه الاصاغر بالاكابر

তার সংগ্রহে উঁচু সনদের কিছু হাদিস ছিলো। এর মাধ্যমে নেক উত্তরসূরীগণ নেক পূর্বসূরীদের সাথে মিলিত হয়েছেন।(ওয়াফায়াতুল আয়ান,খ:২,পৃ:৪৭৭)

অর্থাৎ তিনি হাদিস শুনেছেন পূর্ববর্তী বড় বড় ইমামে হাদীসদের থেকে আর তার থেকে শুনেছেন তার ছাত্রবৃন্দ।অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এই ছাত্রবৃন্দ পূর্ববর্তী ইমামদেরই ছাত্র হয়ে গেছে। ইমাম ইবনুল জাওযী রহ তার সম্পর্কে লিখেন-

و كان لها بر و خير و قري عليها الحديث سنين و عمرت حتي قاربت الماءة

তিনি বড় নেককার ও ভালোমানুষ ছিলেন। বছরের পর বছর তিনি হাদীসের দরস দিয়েছেন। তিনি প্রায় একশত বছর হায়াত পেয়েছেন। (আল মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম,খ:১৮,পৃ:২৫৪)

খতীবে বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদে সেখানকার মহিলা রাবী ও মুহাদ্দিসাদের আলোচনায় তাদের থেকে হাদিস বর্ণনাকে অনেক গৌরবের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে অনেক মুহাদ্দিসাদের থেকে উপকৃত হতে না পেরে আফসোস প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন,আমি ফাতিমা বিনতে হেলাল ইবনে আহমদ কারাজিয়্যাহ রহ থেকে হাদিস শুনেছি। তিনি সাদেকাহ ও সত্যবাদীনী ছিলেন। বাগদাদের পূর্ব দিকে মঙ্গলবারের হাটের এক পার্শ্বে তার আবাস ছিলো।

বাগদাদের নারী শায়েখ ও মুহাদ্দিসদের মাঝে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ইবনে উবায়েদ ইবনে শিখখীর সাফিয়্যাহ প্রসিদ্ধ শায়খে হাদীস ছিলেন। তিনি আবুল ফাওয়ারিসের প্রতিবেশী ছিলেন। অনেক মুহাদ্দিস তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। মাত্র একজনের ব্যবধানে খতীব বাগদাদি রহ তার পরোক্ষ শাগরেদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।এরপরও সরাসরি শাগরেদ হতে না পারায় তিনি আফসোস করেছেন। তিনি এভাবে তা লিখেছেন –

لم يقدر لي السماع منها،لكن حدثني ابو طاهر محمد بن احمد ابن الاشنان عنها

তার থেকে হাদিস শ্রবণ আমার ভাগ্যে ছিল না। তবে আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে আহমদ উশনানী তার থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ আমাকে বর্ণনা করেছেন।

সিত্তুল ওয়ারা বিনতে ওমর ইবনে আসয়াদ তানূখীয়াহ রহ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তার দরসের মজলিস দামেশক থেকে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তিনি উভয় শহরেই হাদিসের দরস দিতেন। বিশেষত তার সহীহ বুখারী ও মুসনাদুশ শাফেয়ীর দরস খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো।

আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী কুরাইশী বাক্ররী রহ সহীহ বুখারী পড়েছেন সিত্তুল উযারা থেকে।

হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত কিতাব সহিহ বুখারির দরসদানকারী প্রথম নারী কারিমা বিনতে আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাতেম মারজিয়া (রহ.)। তিনি ছিলেন উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, হাদিসের সনদের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমা এবং বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী। ইসলাম ও ইলমের খেদমতে তাঁর বিরাট অবদানের কারণে পরবর্তী আলেমগণ তাঁকে উম্মুল কিরাম উপাধিতে ভূষিত করেন। ইলমের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে আমৃত্যু কুমারী ছিলেন।

নিজের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান হাদিসের বিশুদ্ধতম কিতাব সহিহ বুখারির প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং নিজ এলাকায় এই কিতাবের প্রসিদ্ধ শায়েখদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইমাম আবু হাইছাম কুশমিহানি (রহ.) থেকে বুখারির পাঠ নিয়েছেন। জাহের বিন আহমদ সারাখসি ও আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ ইস্পাহানি (রহ.) থেকেও শিক্ষা লাভ করেন। যখনই তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন তখন সনদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

আবুল গনাঈম নারসি, আবু তালিব হুসাইন বিন মুহাম্মদ জাইনাবি, মুহাম্মদ বিন বারাকাত সাঈদি, আলী বিন হুসাইন ফাররা, আবুল কাসেম আলী বিন ইবরাহিম নাসিব, আবুল মুজাফফর মনসুর বিন সামআনি (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ,ইসলামে নারীর ইলমী অবদান।

সুফিবাদে নারীর ভূমিকা

সুফিবাদ একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মা-সম্পর্কিত আলোচনা এর মুখ্য বিষয়। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো এই দর্শনের মর্মকথা। 'সুফ' অর্থ পশম আর তাসাউফের অর্থ পশমি বস্ত্রে পরিধানের অভ্যাস (লাবসুস-সুফ)। মরমিতত্ত্বের সাধনায় কারও জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাওউফ। যিনি নিজেকে এরূপ সাধনায় সমর্পিত করেন, তাঁকে সুফি বলে।

মুসলিম মহিয়সী নারীদের মাঝে অসংখ্য নারী এমন নেককার এবং বুজুর্গ ছিলেন যাদের পবিত্র আত্মার বরকতে মুসলিম নারীসমাজে তাকওয়া, পরহেযগারী,ইবাদত - বন্দেগী ও আত্মসংশোধনের জাগরণ তৈরি হয়েছে। ওই মহিলা আবেদ, যাহেদ ও সূফীগণ নিজেদের মাঝে অর্থাৎ মহিলা অঙ্গনে আধ্যাতিকতা ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট কর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের ঘরে, খানকায় নারীদের আত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের কাজ হয়েছে। তাদের ফয়েজ ও বরকতের ধারায় মানুষের মাঝে সততা,আধ্যাত্মিকতা, জীবন্ত বন্দেগির বন্যা বয়ে গেছে।

উম্মে আহমদ যুলাইখাহ গযনবীয়্যাহ ওয়ায়েজ তথা বক্তা উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অত্যন্ত পর্দা পুশিদার সাথে চলতেন। তিনি নারীদের কাছে গিয়ে গিয়ে ওয়াজ করতেন, দীনের পথে চলতে উউদ্বুদ্ধ করতেন।

ফাতিমা বিনতে হুসাইন রাযিয়াহ রহ ওয়ায়েজ তথা বক্তা উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার ও সূফী ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওযী রহ লিখেছেন,

كانت واعظة متعبدة لها رباط تجتمع فيه الزاهدات

তিনি বক্তা ও ইবাদতগুজার ছিলেন ।এবং তার খানকা ছিলো, যেখানে আবেদা, যাহেদা নারীগণ একত্রিত হতেন।

তাজুন্নিসা বিনতে রুস্তম আসফাহানিয়্যাহ রহ মক্কা মুকাররমায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করে দুনিয়াবিরাগী ও আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করেন।ইমাম তাকিউদ্দিন ফাসি রহ লিখেছেন,

و كانت مقدمة الصوفية بها

তিনি মক্কা মুকাররমায় সূফীদের মাঝে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন।

এমনিভাবে মক্কা মুকাররমায় প্রসিদ্ধ আলেমা, যাহেদা হজরত সাফিয়্যাহ বিনতে ইব্রাহিম রহ সম্পর্কে ইমাম তাকিউদ্দিন রহ এর বক্তব্য হলো –

شيخة الصوفيات خادمة الفقراء بالحرمين الشريفين

তিনি মক্কা,মদিনায় নারী সূফীদের সর্দার ও দরিদ্রের সেবক ছিলেন। (আল ইকদুস সামিন ফি তারিখিল বালাদিল আমিন, খ:৮,পৃ:২৫৯)

অর্থাৎ সাফিয়্যাহ বিনতে ইব্রাহিম রহ হারামাইনের আবেদা,যাহেদা ও সূফীয়াদের অনুসৃত ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা ও সংশোধনের খেদমত করতেন,পাশাপাশি পুরুষ ফকির,আবেদ ও যাহেদদেরও খেদমত করতেন।

ফাতেমা বিনতে আব্দুর রহমান হাররানিয়া রহ এর উপাধি ছিলো 'সূফীয়া' ।তার ইবাদত ও আধ্যাতিকতা সম্পর্কে খতীব বাগদাদী রহ বলেন, তিনি সূফীয়া উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ তিনি বাস্তবেই 'সওফ' তথা পশমের কম্বল গায়ে দিয়ে থাকতেন।এবং ষাট বছরের ও বেশি সময়কাল যাবত তিনি শুধু নামাজের বিছানায় শুয়েছেন।

বসরার রাবেয়া আল-আদাবিয়ার, যিনি রাবেয়া বসরী নামেই বিখ্যাত। এখনো সুফিবাদের ইতিহাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। বহু বছর তার জীবন, ভাবনা সুফিবাদীদের প্রেরণা দিয়েছে এবং এখনো সুফি সাহিত্যে তিনি উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে আছেন। তিনি আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের ধারণাকে প্রচার করেছিলেন। রাবেয়া কবিতায় মানব জীবনের ভঙ্গুরতা ও আল্লাহর পরম আশ্রয়ের বাণী প্রচার শুরু করেন। তিনি দোজখের ভয়ের চেয়ে আল্লাহর প্রতি প্রেমকেই বেশি গুরুত্ব দিলেন। এমন দর্শনে সিক্ত রাবেয়ার কবিতা আজও পঠিত হয়। নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি অনেক রূপক গল্পেরও অবতারণা করেন। তিনি বৈষয়িক দুনিয়ায় না মজে অধ্যাত্মবাদী ভাবনাকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি ভক্তি, বিনয় আর দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে আহ্বান জানালেন।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) সকল বিপদ-আপদকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতেন। আর কেনই বা মনে করবেন না। কারণ এ জগতে যারাই আল্লাহর বন্ধু হতে চেয়েছেন তাদের ঈমানের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। "তোমরা কি ধারণা করেছ এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা অবগত আছে তোমাদের মাঝে কে জিহাদ করছে আর কে ধৈর্য ধারণ করছে" [সূরা আলে ইমরান: ১৪২]।

এক সময় রাবেয়া বসরী দাসত্ব জীবনও অতিবাহিত করেছেন। তার মনিব ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। বিরামহীনভাবে তিনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। মনিবের নির্ধারিত কাজ শেষ করার পর মহান রবের ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন তিনি। মূলত রাবেয়া বসরীর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা।

নারীদের মাদরাসা -মক্তব প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তার শিক্ষা কার্যক্রমে নারীদের ভূমিকা ও অবদানের উল্লেখযোগ্য কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও সেখানে পাঠদানের মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তৃতিতে নারীর ভূমিকা খুবই গৌণ। ইসলামী সভ্যতা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ইসলামী সভ্যতার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত জ্ঞানের জগতে নারীর বিচরণ ছিল অবাধ।

মাদরাসা মক্তবের য়ে রূপ বর্তমানে রয়েছে তার সূচনা হয় হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে।এর আগে আলেমরা নিজ বাড়িতে, এলাকায়, পান্জেগানা,মসজিদে ও জামে মসজিদসমূহে দরসের আয়োজন করতেন।বর্তমানের মাদরাসা ও জামিয়াগুলোর মতো শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিলো সেইসব দরসগুলোতে।সেই সময় নারী আলেমা, ফাযেলাগণও নিজ নিজ বাড়িতে দরস ও তালীম প্রদানের ব্যবস্থা করতেন।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী আয়েশা (রা.) ছিলেন এ ধারার সফল ব্যক্তিত্ব। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে

গ্রহণ করেন এবং নিজের ঘরকে বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করেন। আয়েশা (রা.)-এর পর অসংখ্য মুসলিম নারী জ্ঞানের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। তবে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

মুসলিম নারীদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪৫ হিজরীতে মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম অঞ্চলের ফাস নামক শহরে। যা আজও জামিয়া কযবিন নামে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার ফয়েয বরকত সমগ্র মুসলিম জগতের বড় বড় বিদ্যাপিঠগুলোর মতই ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবিদার হলেন, ফাস শহরের একজন আবেদা, যাহেদা ও নেকদিল মহিলা উম্মে বানীন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ফেহরিয়া রহ। তিনি এই জামিয়ার ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যেন কোনোরকম হারাম মালের সন্দেহ ও না থাকে। মাদরাসা নির্মানের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন তিনি রোজা রাখতেন। হাওয়ারা গোত্রের এক লোকের কাছ থেকে এই ভূমিটি ক্রয় করেছিলেন তিনি। বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে তিনি এর মূল্য পরিশোধ করেছিলেন। জামিয়াটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় পহেলা রমজান ২৪৫ হিজরি রোজ শনিবার।

তার মতো তার বোন মারয়াম বিনতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ফেহরিয়া রহ সেই বছরই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।যেখানে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি খরচ করেছিলেন। পরবর্তীতে এই মসজিদ জামিউল উন্দুলুস নামে প্রসিদ্ধ হয়।এখান থেকেও শত শত বছর জ্ঞান বিদ্যার ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীতে একে জামে কযবিনের শাখা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।(হাদিরাতুল আলামিল ইসলামি)

দামেস্ক ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জৌলুসপূর্ণ ও আলোকদীপ্ত শহর। ক্ষমতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা সব দিক থেকেই তা ছিল মানুষের

আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। দামেস্কে বহু নারী পণ্ডিত, ফকিহ, হাদিসবিশারদ ও কবির আগমন ঘটে।

নারীরা এখানে একাধিক মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু ৫২৬ থেকে ৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নারীরা সেখানে ১৯টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন ১. মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা বারানিয়্যা, ২. মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা জাওয়ানিয়্যা, ৩. মাদরাসাতুল কুতবিয়্যা, ৪. মাদরাসাতুশ শামিয়্যা বারানিয়্যা, ৫. আল মাদরাসাতুল আজরাবিয়্যা, ৬. আল মাদরাসাতুল মারিদিনিয়্যা, ৭. আল মাদরাসাতুল ফররুখ শাহিয়্যা, ৮. আল মাদরাসাতুশ শামিয়্যা আল জাওয়ানিয়্যা, ৯. মাদরাসাতুস সাহিবাহ, ১০. আল মাদরাসাতুল মাইতুরিয়্যা, ১১. আল মাদরাসাতুল কামিলিয়্যা, ১২. আল মাদরাসাতুদ দিমাগিয়্যা, ১৩. আল মাদরাসাতুল আতাবিকিয়্যা, ১৪. মাদরাসাতুল আলিমা, ১৫. আল মাদরাসাতুল হাফিজিয়্যা, ১৬. আল মাদরাসাতুল মুরশিদিয়্যা, ১৭. আল মাদরাসাতুল আদিলিয়্যা আস-সুগরা, ১৮. আল মাদরাসাতুশ শোমানিয়্যা, ১৯. আল মাদরাসাতুল জামালিয়্যা। এ ছাড়া নারীরা খানকা, আশ্রয়কেন্দ্র, আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন।

মক্কা মুকাররমায় কাজি শায়েখ শাহাবুদ্দিন তবারী এর কন্যা উম্মে হুসাইন একজন মুহাদ্দিসা, ফকিহা, আবেদা ও যাহেদা নারী ছিলেন। তিনি মক্কায় অনেক জনকল্যাণমুখী কাজ করেছেন। যার মধ্যে এতিমদের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান ও ছিলো। এই প্রতিষ্ঠানটির। জন্য তিনি মক্কা ও মক্কার বাইরে অনেক সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন; যেন এতিমদের শিক্ষা-দীক্ষা নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

ফিলিস্তিনে নারীদের প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মাদরাসা হলো 'আল মাদরাসাতুল বারুদিয়্যা', 'আল মাদরাসাতুল উসমানিয়্যা' ও 'আল মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা'।

মধ্য এশিয়ার মার্ভ শহরে 'আল মাদরাসাতুল খাতুনিয়্যা' নামে একটি বড় মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন আইয়ুবীয় বংশের একজন অভিজাত নারী। ভারতবর্ষে ভূপালের রানি শাহজাহান বেগম একাধিক মাদরাসা, মসজিদ ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানা রাজিয়া দিল্লি ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শতাধিক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

মক্কা মুকাররমায় পানির নালা তৈরী

মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় বাদশা হারুনর রশীদ রব এর স্ত্রী জুবাইদা রহ -এর জনকল্যাণমুখী কাজসমুহের কল্যাণে যুগ যুগ ধরে মানুষ উপকৃত হয়েছে। বিশেষত 'নহরে যুবাইদা' বা যুবাইদা খাল এই নেককার মহিলার জীবন্ত ও প্রাণবন্ত কীর্তি। তার সদকা ও জনকল্যানকর কাজের তালিকা অনেক দীর্ঘ।

মরুপ্রবণ পবিত্র মক্কায় জমজমের পানি ছাড়া তেমন কোনো পানির উৎস ছিল।

ফলে হাজিরা সেকালে সুপেয় পানির অভাবে কষ্ট পেতেন। ১৯৩ হিজরিতে খলিফা হারুন অর রশীদের সময়ে পানির অভাব এতই তীব্র হয় যে এক বালতি পানি ২০ দিরহামে বিক্রি করা হতো রানি জুবাইদা একবার স্বপ্নযোগে দেখতে পান, তিনি এমন কাজ করবেন। যাতে অগণিত মানুষ উপকৃত হবে ।

তিনি তাৎক্ষণিক পবিত্র মক্কায় পানির সমস্যা চির অবসানের জন্য একটি খাল খননের সিদ্ধান্ত নেন। যেখান থেকে মক্কায় পানি আনা সম্ভব, এমন একটি উৎস খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন।

মক্কা উপত্যকার আশপাশে কিছু কূপ থাকলেও পানির উপযুক্ত দুটি উৎস পাওয়া যায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে হুনাইন এবং আরাফায়। তার নির্দেশ মোতাবেক পানি আনয়নের জন্য খাল খনন কাজ শুরু হয়। পানির সহজলভ্যতা এবং এ খালের রক্ষণাবেক্ষণে প্রতি ৫০ মিটার অন্তর একটি করে কূপ খনন করা হয়। আশপাশের ছোট ছোট পানির উৎসকে এ জলপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত করে পানিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা হয়েছিল। ঐ খাল পরবর্তীকালে নহর-এ-জুবাইদা বা জুবাইদার খাল নামে পরিচিতি পায়।

উম্মে হুসাইন নামক এক মহিলা 'মাসআ' বা সাঈ করার স্থানে একটি জলধারা তৈরি করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। জান্নাতুল মুআল্লার নিকটবর্তী একটি জলধারা ছিলো যা সুফি উম্মে সুলাইমানের নির্মিত।মিসরের সুলতান মালিকের বোন ‘সবীলুসসিত' নামে একটি জলধারা তৈরি করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। যায়নাব বিনতে কাজী শাহাবুদ্দীন তার ভাই কাজী নাজিমুদ্দিনের ইসালে সওয়াবের জন্য 'সাবিলুস সায়্যিদাহ'

নামে একটি জলধারা তৈরি করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। খলীফা মুকতাদির আব্বাসী ও তার মা দুজনে মিলে 'জুখী' নামক একটি জলধারা তৈরি করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। সূফী উম্মে সুলাইমান সূকুললাইল নামক স্থানে মহিলাদের জন্য আলাদা অযু, গোসল ও এস্তেনজাখানা নির্মাণ করেছিলেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় মুসলিম নারী

ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আয়েশা রা: মুয়াবিয়া ও আলী রা:-এর মধ্যকার সঙ্কট নিরসনে এগিয়ে আসেন। তেমনি সাওদা বিনতে আম্মারা বিন আশতার হামদানি তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মুয়াবিয়া রা:-এর কাছে যান এবং দাবি ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। মুয়াবিয়া রা: তাদের দাবি মেনে নেন এবং ইবনে আরতাকে বরখাস্ত করেন। (আকদুল ফারিদ, পৃষ্ঠা-৩৪৪-৪৬)।

তারকান বিনতে তারায সুলতান মালিক শাহ এর স্ত্রী ছিলেন। তার পিতা তারায পারস্যের বাদশাহ আফরাসিয়াবের বংশধর ছিলেন। এই নারীর মন-মানসিকতা ও চিন্তা চেতনা ছিলো রাজপরিবারের একজন সদস্যের মতোই।মালিক শাহের ইন্তেকালের পর তিনি ইস্পাহানের রানী হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, ধীমান ও দূরদর্শী নারী ছিলেন। পাশাপাশি উন্নত রূচি ও শান শওকতের অধিকারী ছিলেন। তিনি সরকারি ধনভাণ্ডার রক্ষা করেছেন, সেনাবাহিনীকে সুগঠিত করেছেন এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নিজেও বাহাদুরির সাথে যুদ্ধ করেছেন। তার ইন্তেকালের সময় দশ হাজার তুর্কী সেনা তাফ সাথে ছিলো। তার রাষ্ট্র পরিচালনা ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা স্মগ্র দেশবাসীকে শান্তিতে ও নিরাপদে রেখেছিলো। তিনি ৪৮৭ হিজরীর রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন।

সাজারাতুদ্দুর উম্মে খলিল সুলতান মালিক সালেহ এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলেন।তিনি তুর্কী বংশোদ্ভুত মহিলা ছিলেন এবং অত্যন্ত বাহাদুর, বুদ্ধিমতী ও বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সুলতান মালিক সালেহ এর ইন্তেকালের সংবাদ প্রথমেই কাউকে জানতে দেন নি; রাজত্বের শীর্ষস্থানীয়দেরকেও না, বরং সুলতানপর মোহর ব্যবহার করে নিজেই বিভিন্ন শাহী ফরমান জারি করতেন। নিজের বুদ্ধিমত্তায় তিনি একসময় অনেক সম্মান লাভ করেন। জুমার খুতবায় তার নাম উচ্চারিত হতে থাকে। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চালাতে সক্ষম হননি।মিসরের বাদশা আল মুইজ তার রাজত্ব দখল করে নেন এবং তাকে বিবাহ করেন। এখানেও তিনি বাদশার উপর কর্তৃত্ব করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার করুন পরিণতি হয়।তাকে হত্যা করে মিসরের দূর্গ প্রাচীর থেকে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।

মায়ের নামে প্রসিদ্ধ আলেমগণ

অনেক উলামা, ফুযালা ও আইম্মায়ে দীনের মা-ই ছিলেন বড় আলেমা,ফাযেলাা ও আকেলা ছিলেন। কিংবা কোনো বিশেষ গুনের কারণে তার প্রসিদ্ধি ছিলো।। কিংবা সন্তানের শিক্ষা দীক্ষায় তার ভূমিকাই বেশি ছিলো, যে কারণে এই আলেমগণ পিতার নামের পরিবর্তে মাশের নামে সম্বন্ধিত হতেন এবং সেই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করতেন। সাহাবাদের মাঝেও অনেকে তাদের মায়ের নামে পরিচিত ছিলেন। যেমন –

হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানাহ রা এর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুতা ইবনে আমর ইবনে কিন্দাহ। হাসানা হলেন তার মা।

হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়াহ এর পিতার নাম মা'বাদ ইবনে শারাবীল ইবনে সাবা। তার মায়ের নাম খাসাসিয়াহ।

হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম রা এর নাম আমর ইবনে কায়েস ।তার মা উম্মে মাকতুমের নাম আতেকা বিনতে আব্দুল্লাহ।

হজরত ইবনে বুহায়নাহ রা এর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক। তার মায়ের নাম বুহায়নাহ বিনতে হারেস ইবনে মুত্তালিব ইবনে আব্দে মানাফ।

হজরত মুয়াজ ইবনে আফরা রা এর নাম মুয়াজ ইবনে হারেস ইবনে রিফাআ। তার মায়ের নাম আফরা বিনতে উবাইদ।

হজরত হারেস ইবনে বারসা রা এর নাম হারেস ইবনে মালেক। তার মায়ের নাম বারসা বিনতে রবীয়া।

উলামা মুহাদ্দীসদের মাঝেও অনেকের নামের সম্পর্ক তাদের মায়ের নামের সাথে। যেমন – ইবনে উলাইয়াহর নাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মিকসাম।তার মায়ের নাম উলাইয়াহ বিনতে হাসসান।

ইবনে আয়েশার নাম মুহাম্মাদ ইবনে হাফস ইবনে ওমর। মায়ের নাম আয়েশা বিনতে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ।

ইবনে বিনতে সুদ্দির নাম ইসমাইল ইবনে মুসা ফাযারী।মায়ের নাম বিনতে ইসমাইল ইবনে আব্দুর রহমান সুদ্দী।

ইবনে বিনতে শাফেয়ীর নাম আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। মায়ের নাম যায়নাব বিনতে ইমাম শাফেয়ী।

ইমাম ইবনে মাজার নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজা আল - রাবী আল - কুয়াইজুইনি । তার বাবার নাম আব্দুল্লাহ ।এবং তার মায়ের নাম মাজা।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে নারীদের ইলমী অবদান

ইসলামের প্রতিটি যুগেই ধর্মীয় কাজে পুরুষদের সাথে নারীরাও সমানতালে অংশগ্রহন করেছেন।শিক্ষা দীক্ষা এবং ধর্মের প্রচার প্রসারে মহিলারাও সমানভাবে খেদমত করেছেন। সাহাবা,তাবেয়ী,তাবে তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তী যুগেও হাদিস সংকলন, বর্ণনা,ফিকহ,ফতোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তারা তাদের কীর্তি রেখে গেছেন। অনেক যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকিহরাও ঐসমস্ত নারীদের নিকট ইলম অর্জন করেছেন যারা ইলম, আমল,তাকওয়া,পরহেজগারি এবং হাদীস ও আসার বর্ণনায় যুগবিখ্যাত ছিলেন।

প্রথম যুগে নবীজীকেই সমস্ত সমস্যার সমাধান এবং মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো। আর নবীজী(সা:) তার সমাধান বলে দিতেন। কিছু বর্ণনায় আছে যপ,নবী যুগে শুধু হজরত আবু বকর(রা) ও ওমর(রা) দুজনে ফতোয়া দিতেন।

আবার কোনো সাহাবীকে আমীর বা শিক্ষক নিযুক্ত করপ পাঠালে তারাও কুরআান ও হাদীসের আলোকে ফতোয়া দিতেন। অনেক হাদিসে পাওয়া যায় যে, নবী কারিম (সা) বিশেষ কোনো সাহাবার ইলমের পরিপূর্ণতার কথা বলে মানুষকে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই রীতিই ছিলো যে,মানুষ ব্যাক্তিবিশেষ এর কাছে গিয়ে মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতো।অবশেষে ১৪০হিজরী থেকে ১৫০ হিজরির মধ্যে পুরো মুসলিম বিশ্বে ফিকহী তরতীব অধ্যায় ইবন্যোস হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়। এই সময়টার আগে হাদিস ও ফিকহের অধিকারী উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ পদ্ধতিতে ফতোয়া ও হাদীসের খেদমত আনজাম দিয়েছেন। এইসব খেদমতে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহন ছিলো।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিদের মধ্যে যাদের থেকে ফিকহী মাসায়েল ও ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে ও সংকলিত হয়েছে তাদেরকে তিনটি স্তরে ভাগ করে প্রত্যেক স্তরের পুরুষ ফকীহ, মুফতীদের মত নারী ফকীহ ও মুফতীদের নামও উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তরে তথা বেশি হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন সাতজন বড় বড় সাহাবী আছেন যাদের ফতোয়াগুলো যদি একত্রিত করা হয় তাহলে প্রত্যেকের বড় বড় কিতাব তৈরি হয়ে যেতে পারে।খলিফা মামুনের প্রপৌত্র আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে ইয়াকুব ইবনে আমীরুল মুমিনিন মামুন রহ.এইসব সাহাবাদের মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর ফতোয়াসমূহ বিশ খন্ডে সংকলন করেছেন। এই স্তরের উলামাদের মাঝে হজরত আয়েশা রা. ও রয়েছেন।

দ্বিতীয় স্তরে তেরজন সাহাবির নাম রয়েছে যাদের ফতোয়া সংকলিত হলে মাঝারি আকারের কিতাব হয়ে যাবে।এদের মাঝে রয়েছেন উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালমা (রা) ।

তৃতীয় স্তরে বাকি সাহাবাদের নাম রয়েছে যাদের প্রত্যেকের ফতোয়া ও আলাদা আলাদা রিসালার রূপ নিতে পারে।এই স্তরে রয়েছেন উম্মুল মুমিনিন হজরত সাফিয়্যাহ (রা),উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা (রা),উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবা(রা), উম্মুল মুমিনিন হজরত জুয়াইরিয়্যাহ রা.,উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা.,হজরত ফাতিমারা., হজরত আতিয়্যাহ রা.,হজরত আসমা বিন্তে আবু বকর রা.,হজরত উম্মে শারিক রা.,হজরত উম্মে দারদা রা.,হজরত আতেকা বিনতে যায়েদ রা.,হ হজরত ফাতিমা বিনতে কায়েস রা.,হজ্রত লায়লা বিনতে কায়েফ রা.,হজ্রত হাওলা বিনতে তুওয়াইত রা.,হজরত সাহলা বিনতে সুহাইল রা.,হজরত উম্মে সালামা রা.,হজরত জায়নাব বিনতে উম্মে সাল্মা রা.,হজরত উম্মে আয়মান রা.,হজরত উম্মে ইউসুফ রা.,ও হজরত গামেদিয়াহ রা.। এদের মধ্যে কয়েকজন তাবেয়িও রয়েছেন।

এই তালিকায় একশ ত্রিশজন ফকিহ সাহাবির মধ্যে বাইশজন মহিলা ফকিহ ও মুফতি রয়েছেন,যাদের প্রত্যেকের ফিকহি মাসায়েল ও ফতোয়া বড় বড় খন্ডে,মাঝারি ধরনের কিতাবে কিংবা ছোট ছোট রিসালায় সংকলিত হওয়ার মতো।এইসব মহিলা সাহাবির জ্ঞান ও ফিকহি গভিরতার গ্রহনযগ্যোতা ও প্রসিদ্ধি সাহাবা,তাবেয়ি যুগেই ব্যাপক ছিলো। এখানে উল্লেখিত নারী ফকীহ ও মুফতীদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা)

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা. 'উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকিহ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ।ফিকহ, হাদিস, ফারায়েজ,আহকাম,হালাল-হারাম,চিকিৎসা ও কবিতা,মোটকথা অনেক বিষয়ের জ্ঞানের আধার ছিলেন তিনি।সেই যুগে তিনি এসব বিষয়ে বড় পনডিত হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন তিনি। তার মেধা ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানের কথা সর্বজন বিদীত ছিল।

ইসলামের বিভিন্ন মাসআলার নীতিগত বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নেওয়া হতো। তুলনামূলক কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। অনেক সাহাবি ও তাবেঈ তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ২১০টি।

হযরত আবু মুসা আশআরি রা. বলেন,সাহাবাগন সমাধানের জন্য কন বিসয় নিয়ে হজরত আয়েশা রা. এর কাছে গেলে তিনি তার কাছ থেকে যথাযথ সমাধান পেয়ে যেতেন।

ইমাম যুহরি রহ. বলেন,হজরত আয়েশা রা. ছিলেন আ'লামুন্নাস,অর্থাৎ সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং প্রবীণ সাহাবিরাও তার সাথে দ্বীনি ও ইলমী বিষয়ে আলোচনা করতেন।

ইমাম মাসরুক রহ. বলেন,আল্লাহর কসম আমি মাসায়েখ এবং প্রবীণ সাহাবিদেরকে ফারায়েজ সম্পর্কে হজরত আয়েশা রা কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।

আবু সালামা আব্দুর রহমান রা. বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস,সুন্নত,ফিখি মতামত,আয়াতের শানে নুযুল ও বিধান জানার জন্য যদি কাউকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হত তাহলে আয়েশা রা. -এর চেয়ে বড় আলেম আর কেউ ছিলো না।

হযরত উরউয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন –

আমি হালাল হারাম জ্ঞান , কবিত্ব, চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা) অপেক্ষা অধিক পারদর্শি কাউকে দেখিনি।

আল্লামা জাহাবী বলেন—

তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞান ভান্ডার। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে , সার্বিকভাবে মহিলাদের মধ্যে তাঁর মত বড় জ্ঞানী ব্যাক্তি নেই।

ইলম ও ইজতিহাদ বা জ্ঞানে আযরত আয়েশা (রা) কেবল মহিলাদের মধ্যেই নন, বরং পুরুষদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। কুরআন , সুন্নাহ, ফিকাহ, আহকাম বিষয়ক জ্ঞানে তার স্থান ও মর্যাদা এত উর্ধে যে- উমর (রা) , আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের সাথে তাঁর নামটি নির্দ্বিধায় উচ্চারন করা যায়।

তাফসিরে জালালাইন কিতাবে প্রখ্যাত মুফাস্সির কিরামের যে তালিকা দেয়া হয়েছে, তাতে হযরত আয়েশা (রা) কে তাফসির কারকদের মধ্যে প্রথম থকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে।

মাহমুদ ইবনে লাবিদ রহ. বলেন-

كان ازواج النبي. ص.يحفظن من حديث النبي-صل الله عليه و سللم-كثيرا و لا مثلا لعاءشة و ام سلمة.و كانت عاءشة تفتي في عهدي عمر و عثمان.الي ان ماتت يرحمها الله. و كان الاكابر من اصحاب رسول الله. صل الله عليه و سلم-عمر و عثمانبعده يرسلان اليها فيسالانها عن السنان

সাধারণভাবে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী তার হাদিস অনেক বেশি মনে রাখতেন।কিন্তু এই বিশয়ে হজরত আয়েশা রা. এবং হজরত উম্মে সালামা রা.এর কোনো তুলনা নেই।হজরত উমর রাঃ এবং হজরত উসমান রা: এর খেলাফতকালেও হজরত আয়েশা রা ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি শেষজীবন পর্যন্ত ফতোয়া দিএ গেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর তার প্রবিন

সাহাবিরা;হজরত উমর রাঃ এবং হজরত উসমান রা. বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নাহর বিশয়ে জানার জন্য তার কাছে যেতেন, লোক পাঠাতেন।

ইমাম যুহরি রহ. আরো বলেন-

لو جمع علم عاءشة الي علم جميع ازواج النبي صلي الله عليه و سلم و علم جميع النساء لكان علم عاءشة افضل.

যদি নবিজির সকল স্ত্রী এবং সকল মুসলিম মহিলাদের ইলম একত্রিত করা হয়, তবুও হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর ইলম বেশি উত্তম হবে।

এ উম্মতের উপর তার বরকত অনেক, তিনি কুরআনের বেশ কিছু আয়াত নাযিলের পটভূমি ছিলেন, তার মধ্যে রয়েছে তায়াম্মুমের আয়াত। একদা তিনি বোন আসমা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে একটি হার ঋণ নেন, পরে তার থেকে যা হারিয়ে যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কতক সাহাবিকে হার খুঁজে আনার জন্য প্রেরণ করেন, হার অনুসন্ধানে তাদের সালাতের সময় হয়ে যায়, তাদের নিকট পানি ছিল না, তাই তারা ওযু ব্যতীত সালাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তারা অভিযোগ করেন, অতঃপর তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়, তখন উসাইদ ইব্ন হুজাইর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলেন: "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তুমি যখনই কোন সমস্যায় পতিত হয়েছ, তোমার জন্য আল্লাহ তা থেকে মুক্তির পথ করে দিয়েছেন এবং মুসলিমদের জন্য তাকে বরকত রেখেছেন"। [বুখারি ও মুসলিম]

ইমাম জাহাবি রহ. তাজকিরাতুল হুফফায কিতাবে লিখেছেন,

من اقبر فقهاء الصحابة.كان فقهاء اصحاب رسول الله صلي الله عليه و أله و سلم يرجعون اليها.تفقه بها جماعة.

হজরত আয়েশা রা. থেকে হাদিস ও তার ফিকহি মতামত ও তার ফতওয়া বর্ননাকারির সংখ্যা অনেক।এদের মধ্যে তার নিজের আত্মীয় স্মজন এবং বংশের লোকেরাও রয়েছে।তার বোন উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রা., দুধ ভাই আউফ ইবনে হারেস

ইবনে তুফায়েল রা. ,দুই ভাতিজা কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর ও আবদুল্লাহ ইবনে মোহম্মাদ ইবনে আবু বকর,দুই ভাতিজি হাফসা বিন্তে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ও আসমা বিনতে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা.,দুই ভাগ্নে উরওয়া ইবনে জুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা., (এই দুইজন হজরত আসমা ইবনে আবু বকর রা. এর পুত্র)ভাগ্নি আয়েশা বিনতে তালহা রা.।এ ছাড়াও তার হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আতিক রা., মহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা., আব্বাদ ইবনে হাবিব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.,আব্বাদ ইবনে হামজা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. এবং গোলামদের মধ্যে আবু ইউনুস,যাকওয়ান,আবু ওমর ও ইবনে ফররুখ রা.।

সাহাবাদের মধ্যে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে আস রা., আবু মুসা আশআরি রা., জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রা,আবু হুরায়রা রা,আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা,আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা,রবিয়া ইবনে আমর জুরাশি রা,সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রা,আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নাওফাল রা. প্রমুখ।

তাবেয়িদের মধ্যেও অসংখ্য তাবেয়ি তার কাস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাবেয়িরা ছাড়া ও আরো অনেক উলামা তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন।

উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা.

উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়াহ রা.-এর নাম হিন্দ।তার প্রথম বিয়ে হয় আবু সালামাহ ইবনে আবুল আসাদ রা.এর সাথে।তার সেই স্বামির ঘরে তার এক মেয়ে যায়নাব এবং একটি ছেলে ওমর জন্মগ্রহণ করেন। তার ছেলে ওমরের প্রতিপালন পরবর্তীতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি এর ঘরেই হয়।তিনি স্বামীর সাথে প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে তারা মক্কায় ফিরে আসেন।সেখান থেকেই তিনি মদিনায় হিজরত করেন। ঐতিহাসিকদের মতে,তিনিই

নারীদের মধ্যে প্রথম হিজরতকারী। পরবর্তীতে তার স্বামির মৃত্যুর পরে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

হাদিস ও ফিকহে হজরত আয়েশা রা এর পর নারী সাহাবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী ছিলেন। মাহবুব ইবনে ল্যাবীদ রহ.-এর বক্তব্য ইতিপূর্বে গিয়েছে-

كان ازواج النبي. ص.يحفظن من حديث النبي-صلي الله عليه و سلم- كثيرا و لا مثلا لعاءشة و ام سلم

সাধারণভাবেই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ তার হাদিস অনেক বেশি মনে রাখতেন। কিন্তু হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা ও হজরত উম্মে সালামা রা এ বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন।

তার আজাদকৃত গোলাম শায়বাহ ইবনে নিসাহ ইবনে সারজিস ইবনে ইয়াকুব মদিনা মুনাওয়ারায় সেই সময়ে ইমামুল কুররা ছিলেন। হজরত নাফে মাওলা ইবনে ওমর তাজবিদ ও কেরাতের বিষয়ে তার ছাত্র ছিলেন। হাসান বসরি রহ.-এর আম্মা খায়রাহ তারই আজাদকৃত দাসী।

হজরত উম্মে সালামা রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়াও তার পূর্বের স্বামী আবু সালামাহ ইবনে আব্দুল আসাদ রা. ও হজরত ফাতিমা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ণানাকারীদের মধ্যে রয়েছেন, আপন পুত্র ওমর ইবনে আবু সালামাহ রা., কন্যা যায়নাব বিনতে আবু সালামাহ রা.,ভাই আমের ইবনে আবু উমাইয়া, ভাতিজা মুসআব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া এবং তার আজাদকৃত গোলাম নাবহান,আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে,নাফে,সাফিনাহ,আবু কাসীর,ইবনে সাফীনাহ ও খায়রাহ।

এছাড়াও রয়েছেন, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার,উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসাহ,হিন্দ বিনতে হারেস ফারাসিয়া,সাফিয়াহ বিনতে শাইবাহ,আবু উসমান নাহদি,হউমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ,সাইদ ইবনে মুসায়্যিব,আবু ওয়ায়েল,সাফিয়্যাহ বিনতে মুনজির,শা'বি,আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দিক, আব্দুর রহমান ইবনে হারেস

ইবনে হিশাম,তার দুই পুত্র ইকরামাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ও আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারেস,কাবিসাহ ইবনে যআইব,নাফে মাওলা ইবনে ওমর, লাইলা ইবনে মামলাক সহ আর অনেক আলেম ও ফকিহগন।

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা রা

উম্মুল মুমিনিন হজরত হাফসা বিনতে ওমর ইবনে খাত্তাব রা. প্রথমে খুনাইস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফাহ সাহমির স্ত্রী ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় বা তৃতিয় হিজরীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন।তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা এর সহোদর বোন।

তিনি অত্যন্ত বুযুর্গ এবং সালেহা মহিলা ছিলেন। অধিক পরিমানে রোজা রাখতেন আর নামাজ পড়তেন।আবু বকরের খিলাফতের সময় সাহাবি জায়েদ ইবনে সাবিতকে কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলনের দায়িত্ব দেয়া হয়। সংকলিত কুরআনটি হাফসা বিনতে উমরের নিকট সংরক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল। উসমান ইবনে আফফান খলিফা হওয়ার পর হাফসার নিকট রক্ষিত কুরআনটিকে প্রামাণ্য ধরে আরো কপি তৈরি করা হয়।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ৬০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। যার প্রায় সবগুলোই সহিহ ছয় হাদিসের কিতাবে আছে।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পিতা হজরত ওমর রা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের কয়েকজন হলেন তার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, ভাতিজা হামজাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের স্ত্রী সাফিয়্যাহ বিনতে আবু উবাইদ,উম্মে মুবাশশির আনসারিয়্যাহ,মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদাআ,হারেস ইবনে ওয়াহাব,শুতাইর ইবনে শাকাল,আব্দুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান ইবনে হিসাম,মুসায়্যিব ইবনে রাফে,আবু মিজলায।এই কয়েকজন ছাড়াও অনেক বড় একটি জামাত তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি মতান্তরে ৪১ বা ৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবাহ রা.

উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে হাবিবাহ রা এর নাম রম্লাহ বিনতে আবু সুফিয়ান সাখার ইবনে হারব।ইসলামের প্রথম দিকেই তিনি মুসলমান হন এবং প্রথম স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদি রা. এর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। তার এই স্বামী হাবশায় গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে যান এবং মদ পান করতে করতে খৃষ্টধর্মের উপর ই মৃত্যুবরণ করেন।কিন্তু তিনি এবং তার মেয়ে হাবিবা বিনতে জাহাশসহ ইসলামের উপর দৃড়ভাবে কায়েম থাকেন।এদিকে নবিজী সা. তার অসহায়ত্বের কথা শুনে বাদশা নাজ্জাশির কাছে হাবিবাহ রা এর জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়।

তিনি ৪৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের আগে তিনি হজরত আয়েশা রা কে ডেকে বললেন, আমাদের সতীনদের মাঝে কোনো ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ তায়ালা যেন মাফ করে দেন।আয়েশা রা ও বললেন,আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন।তখন হজরত উম্মে হাবিবাহ রা বললেন, এই কথা বলে আপনি আমাকে খুশি করে দিয়েছেন,আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাকেও খুশি করেন।এরপর তিনি উম্মে সালামা রা কে ডেকেও একি কথা বললেন।তিনিও এই ধরনের কথা বলে তাকে সান্তনা দিলেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যায়নাব বিনতে জাহাশ রা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।আর তার থেকে বর্ণনা করেন, তার আপন মেয়ে হাবিবা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী,দুই ভাই মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান, ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান, ভাগিনা আবু সুফিয়ান ইবনে সাইদ ইবনে মুগিরাহ ইবনে আখনাস ইবনে শারীক,তার আজাদকৃত দুই গোলাম সালেম ইবনে শাওয়াল ও আবুল জাররাহ,এছাড়াও আবু সালেহ আস সাম্মান,উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের, যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা, সাফিয়্যাহ বিনতে শাইবাহ,শাহার ইবনে হাউশাব প্রমুখ।

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা.

উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা বিনতে হারেস রা প্রথমে আবু সাবরাহ ইবনে আবু রুহাম এর স্ত্রী ছিলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন।তার বিয়ে হয় সারাফ নামক এলাকায়। এই এলাকায় ই ৩৮ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।ইয়াসার তার আজাদকৃত গোলাম।ইয়াসারের চার পুত্র আতা ইবনে ইয়াসার, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, মুসলিম ইবনে ইয়াসার, আব্দুল মালেক ইবনে ইয়াসার ফকিহ ছিলেন।

হজরত আয়েশা রা হজরত মাইমুনা রা সম্পর্কে বলেন,

انها كانت من اتقانا لله و اوصلنا للرحم

তিনি আমাদের সবার মাঝে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু ও আত্মিয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, আর তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার চার ভাগিনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস,আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ,আব্দুর রহমান ইবনে সায়েব,ইয়াযিদ ইবনে আসাম,উবায়দুল্লাহ খাওলানী,আজাদকৃত গোলাম আতা ইবনে ইয়াসার ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, তার দাসী নাদবাহ,ইব্রাহিম ইবনে উতবা,আব্দুল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস, কুরাইব মাওলা ইবনে আব্বাস,উবাইদা ইবনে সাব্বাক,উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা, আলিয়া ইবনে সুবাই প্রমুখ।

উম্মুল মুমিনিন হজরত জুয়াইরিয়্যাহ রা.

উম্মুল মুমিনিন হজরত জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারেস ইবনে আবু যিরার রা প্রথমে মুসাফি ইবনে সাফওয়ান এর স্ত্রী ছিলেন। এক যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করে নেন।তখন সাহাবাগণ তার গোত্রের অন্যান্য বন্দিদের বিষয়ে বলাবলি করতে লাগলেন যে,রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মিয়দের কি কয়েদ করে রাখা কিংবা গোলাম বানানো ঠিক হবে?এরপর বনী মুসতালিকের সকল বন্দিকে আজাদ করে দেওয়া হয়।নবীজীর সাথে হযরত জুয়াইরিয়্যাহ রা. এর বিয়ের ফলে একশ পরিবার মুক্তি পেয়ে যায়।

একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের বেশ কিছুক্ষণ পর হজরত জুয়াইরিয়্যাহ রা এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।দেখলেন, তিনি তখনো নামাজের বিছানায় বসে দোয়া ও যিকির করছেন। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই দোয়া শিক্ষা দিলেন,

سبحان الله عدد ما خلقه، سبحان الله رضا نفسه،سبحان الله زنة عرشه،سبحان الله مداد كلماته

এবং বললেন, তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছো তার মোকাবেলায় এই একটি আয়াতই যথেষ্ট হবে।

হজরত জুয়াইরিয়্যাহ রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন,আর তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, উবাইদ ইবনে সাব্বাক,আবু আইয়ুব মারাগী,মুজাহিদ ইবনে জাবর,কুরাইব মাওলা ইবনে আব্বাস, কুলসুম ইবনে মুস্তালিক,আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ।তিনি ৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

উপরে উল্লেখিত উম্মাহাতুল মুমিনিনদের ফিকহ,ফতওয়ায় বিশেষ জ্ঞান ও প্রসিদ্ধি ছিল।এছাড়াও আরো যারা রয়েছেন, উম্মুল মুমিনিন হজরত সাওদা বিনতে জামআহ রা,উম্মুল মুমিনিন হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা,উম্মুল মুমিনিন হজরত যায়নাব বিনতে খুজায়মা রা, ও হজরত রায়হানাহ বিনতে যায়েদ রা।তারাও ইলমে দ্বিনের প্রচারে ভুমিকা রেখেছেন। তাদের থেকেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের কিতাবসমূহে তাদের বর্ণনাকৃত হাদিস ও ঘটনাবলি পাওয়া যায়। তবপ উপরে উল্লেখিত ছয়জন ফতোয়া ও হাদিসে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

হজরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রা

হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (রা.) ছিলেন অভিজাত ইহুদি বংশের মেয়ে। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজার বিখ্যাত কবি ও নেতা সালাম ইবনে মাশকামের সঙ্গে। সে বিয়ে বেশি দিন টেকেনি। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে হয় হিজাজের বিখ্যাত সওদাগর কিনানা ইবনে আবিল হুকাইকের সঙ্গে। তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল অনেক। সাফিয়া (রা.)-এর বাবা হুয়াই ইবনে আখতাব মদিনার ইহুদিদের বিখ্যাত গোত্র বনু নাদিরের প্রধান নেতা ছিলেন। প্রাচীনকাল থেকে আরবের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বনু কুরাইজা' ও 'বনু নাদির' অন্য ইহুদি গোত্রের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতো। সাফিয়ার বাবা হুয়াইকে তাঁর গোত্রের লোকেরা অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখত। সবাই তাঁর হুকুম ও নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নিত।

সপ্তম হিজরির ঘটনা। খাইবারের যুদ্ধে ইহুদিরা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ যুদ্ধে তাদের গোত্রের বিখ্যাত লোকেরা নিহত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাফিয়ার বাবা, ভাই ও স্বামী ছিল। খাইবারের যুদ্ধে ইহুদিরা পরাজিত হলে মুসলিমদের হাতে প্রচুর ধনসম্পদ গনিমত হিসেবে হস্তগত হয়। বিশাল ধনী হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াও যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলিমদের কবলে আসে।

গনিমতের মাল বণ্টনের সময় সব বন্দীকে হাজির করা হলো। দাহহিয়া কালবি (রা.) নামের সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে একজন দাসীর আবেদন করলে তিনি সাফিয়াকে হস্তান্তর করতে বললেন। এতে সাহাবিরা আপত্তি জানান। তখন রাসুল (সা.) দাহহিয়া কালবির কাছে অন্য একজনকে তুলে দিয়ে সাফিয়াকে মুক্ত করে দেন। পরে রাসুল (সা.) সাফিয়া (রা.)-কে বিয়ে করে তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সাফিয়া (রা.)-এর জীবনের ধারা বদলে যায়। তিনি লেখাপড়া জানতেন। আত্মীয়দের কাছে চিঠি লিখে তাঁদের ইসলামের প্রতি আহ্বান

জানাতেন। এতে বহু ইহুদি ইসলাম কবুল করেন। সাফিয়া (রা.)–এর প্রচুর ধনসম্পদ ছিল। ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল।

সাফিয়া (রা.) ছিলেন স্পষ্টবাদী। একবার এক দাসী খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর কাছে সাফিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, এখনো তাঁর মধ্যে ইহুদি মনোভাব বিদ্যমান। কারণ, তিনি শনিবারকে মানেন এবং ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। দাসীর কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য হজরত উমর (রা.) লোক মারফত সাফিয়া (রা.)-কে অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন।

সাফিয়া (রা.) জবাব দেন, 'যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের বদলে জুমা দান করেছেন, তখন থেকে শনিবার মানার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আর ইহুদিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকার কারণ হলো, তাদের মধ্যে আমার আত্মীয়স্বজন আছে। সে সম্পর্ক আমাকে বজায় রাখতে হয়।'

হিজরি ৩৫ সনে বিদ্রোহীরা হজরত উসমান (রা.)-কে গৃহবন্দী করে, তাঁর বাসায় সবকিছুর সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং বাসাটির চারদিক ঘেরাও করে রাখে। সেই কঠিন সময়ে সাফিয়া (রা.) তাঁর দাসীর মাধ্যমে উসমান (রা.)-এর ঘরে খাবার ও পানি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সাফিয়া (রা.) ছিলেন ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রের কেন্দ্র। প্রায় সময়ই বহু নারী সাহাবি ও নারী তাবেঈন তাঁর ঘরে বিভিন্ন মাসয়ালা জানতে ভিড় করতেন। সাফিয়া (রা.)-এর বর্ণনা করা ১০টি হাদিস পাওয়া গেছে।

হজরত ফাতেমাতুজ্জাহরা রা.

হজরত ফাতেমা বিনতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম রা এর বিয়ে হয়েছিল হজরত আলী রা এর সাথে।নবীজীর হিজরতের একবছর পর তাদের বিয়ে হয়। তার সন্তানদের মধ্যে হজরত হাসান,হজরত হুসাইন, হজরত মুহসিন, হজরত উম্মে কুলসুম কুবরা,হজরত যায়নাব কুবরা।হজরত আয়েশা রা এর সাক্ষ্যমতে

মহিলাদের মাঝে হজরত ফাতেমা রা ও পুরুষদের মাঝে হজরত আলী রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন।হজরত ফাতিমা রা অনেক মর্যাদা ও গুনাবলীর অধিকারী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের ৬ মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

তিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার দুই ছেলে হজরত হাসান রা ও হজরত হুসাইন রা,নাত্নি হজরত ফাতেমা বিনতে হুসাইন ইবনে আলী রহ. তার থেকে মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেন। এছাড়াও হজরত আয়েশা রা, হজরত উম্মে সালামা রা, হজরত আনাস ইবনে মালেক রা,ও হজরত সালমা উম্মে রাফে রা প্রমুখ।

হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.

হযরত আসমা বিনতু আবু বকর সর্বদিক দিয়েই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তার পিতা, পিতামহ, ভগ্নি, স্বামী ও পুত্র সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তার সহোদরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ সাহায্যকারী (হাওয়ারী) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) তার স্বামী এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে শহীদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর তার পুত্র।

হিজরাতের ২৭ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম যুগেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আসমা (রা) তাদেরই একজন। মাত্র সতেরজন নারী পুরুষ ব্যতীত আর কেউ তার আগে এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। তাকে জাতুন নিতাকাইন — দু'টি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী বলা হয়। কারণ, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের সময় তিনি রাসূল (সা) ও তার পিতার জন্য থলিতে পাথেয় ও মশকে পানি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তার মুখ বাঁধার জন্য ধারে কাছে কোন রশি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে নিজের কোমরের নিতাক বা বন্ধনী খুলে দু'টুকরো করে একটি দ্বারা থলি ও অন্যটি দ্বারা মশকের মুখ বেঁধে দেন, এ দেখে রাসূল (সা) তার জন্য দুআ করেনঃ আল্লাহ যেন এর

বিনিময়ে জান্নাতে তাকে দু’টি ‘নিতাক’ দান করেন। এভাবে তিনি ‘জাতুন নিতাকাইন’ উপাধি লাভ করেন।

হযরত আসমা বিনতু আবু বকরের মধ্যে সততা, দানশীলতা, মহত্ব ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার মত এমন সব সুষম চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল যা ছিল বিরল। তার দানশীলতা তো একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তার পুত্র আবদুল্লাহ বলেনঃ “আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়িশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু’জনের দান প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ ছিল। আমার খালার স্বভাব ছিল, প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন, যে যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা’র স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।”

হযরত আসমা থেকে ৫৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বহু বিশিষ্ট সাহাবী তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।হজরত আসমা রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, এবং তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আপন দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের, ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের, ভাতিজি ফাতিমা বিনতে মুঞ্জির ইবনে যুবায়ের, আব্বাদ ইবনে হামজা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আব্বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আজাদকত গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে কায়সান,সাফিয়্যাহ বিনতে শায়বাহ,আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুসলিম মিসরী,আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব,আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকাহ,ওয়াহাব ইবনে কায়সানসহ আরো অনেকে।

হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রা

ফাতিমা বিনতে আসাদ ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) এর মাতা। তিনি আসাদ ইবনে হাশিম এর কন্যা ছিলেন। ফাতিমার স্বামী আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মুহাম্মদ (সা.) এর চাচা। মুহাম্মদ (সা.) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব এর মৃত্যুর পর এতিম মুহাম্মদ (সা.) তার শৈশবের বেশকিছু বছর আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর ঘরে ফাতিমার নিকট অতিবাহিত করেন।

ফাতিমার পিতার নাম আসাদ ইবনে হাশিম,পিতামহ হাশিম ইবনে আবদ মানাফ এবং প্রপিতামহ আবদ মানাফ ইবনে কুসাই । ফাতিমা কুরাইশ গোত্রের হাশিমী শাখার কন্যা। পিতামহ হাশিম ইবনে আবদ মানাফ গিয়ে তার বংশধারা মুহাম্মাদ (সা) বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে। মুহাম্মাদ (সা) এর দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তার শ্বশুর এবং চাচা।

ফাতিমার ছয়টি সন্তান ছিল। তারা হলঃআলী ইবনে আবু তালিব- ইসলামের চতুর্থ খলিফা,জাফর ইবনে আবি তালিব,- মুতার যুদ্ধে ইসলামের সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন,তালিব ইবনে আবি তালিব এবংআকিল ইবনে আবি তালিব।

মুহাম্মাদ(সা) এর দাদা আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর সময় মুহাম্মাদের দায়িত্ব আবু তালিব ও ফাতিমার উপর অর্পণ করে যান। তখন থেকেই মুহাম্মাদ(সা) ফাতিমার সংসারে বেড়ে উঠতে থাকেন। আবু তালিব ও ফাতিমা মুহাম্মাদ(সা)কে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করে লালন পালন করতে থাকেন। সবসময় নিজের অনন্য শিশুদের সাথে খাবার খেতে দিতেন। ছোটবেলায় চারিদিকে সবাই মুহাম্মাদ(সা) এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকার কারণে ফাতিমা তাকে অতিরিক্ত আদর করতেন। মুহাম্মাদ (সা) ছোট বেলা থেকেই পরিপাটি থাকতেন এজন্য ফাতিমা তাকে পছন্দ করতেন। এজন্য মুহাম্মাদ(সা) তাকে দ্বিতীয় মা বলে মনে করতেন।

মুহাম্মাদ (সা) ইসলাম প্রচার শুরু করলে, প্রথম দিকেই ফাতিমা ও তার পুত্র আলী ইসলাম গ্রহণ করেন। ৬২২ খিস্ট্রাব্দে মুহাম্মাদ (সা) মদিনায় হিজরতকালে তার সফর সঙ্গীদের মধ্যে ফাতিমাও ছিলেন।

ফাতিমা ও তার পুত্ররা ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই বনু হাশিম গোত্র তাদের বিরোধিতা ও অত্যাচার করতে লাগলো। একসময় অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে মুহাম্মাদ (সা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে অনুমতি দান করলেন। আবিসিনিয়ায় ফাতিমা নিজে হিজরত না করলেও তার পুত্র জাফর ইবনে আবি তালিব ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস হিজরত করেন।

কুরাইশরা যখন দেখলো মুহাম্মাদ (সা) এর অনুসারীরা বৃদ্ধি পাচ্ছে ধীরে ধীরে غ কুরাইশ তাদের সাথে সমস্ত লেনদেন বন্ধ করে দিলে তারা শিবে আবি তালিব পাহাড়ে বন্ধী হয়ে পরেন। এই তিনটি বছর ফাতিমা বিনতে আসাদ সহ বনু হাশিম গোত্রের সবাই ক্ষুধা অনাহারে গাছের পাতা খেয়ে কোন রকম কাটিয়ে দেন। অবশেষে তিন বছর পর নবুওয়াতের দশম বছরে তারা অবরোধ তুলে নেয়। অন্য মুসলমানদের সাথে ফাতিমা বিনতে আসাদ সহ সবাই মুক্ত জীবনে ফিরে আসেন।

শিবে আবি তালিবে বন্ধী আবু তালিব ও মুহাম্মাদ (সা) এর স্ত্রী খাদিজা রা মারা গেলে কুরাইশরা অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেন। তখন মক্কার মুসলমানরা বাধ্য হয়ে মদিনায় হিজরত করেন। ফাতিমা বিনতে আসাদও অন্যদের সাথে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন।

ইবনে সাদ বলেন, ফাতিমা বিনতে আসাদ একজন সৎকর্মশীলা মহিলা ছিলেন। মুহাম্মাদ(সা) তাকে দেখতে যেতেন এবং তার গৃহে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন। মুহাম্মাদ(সা) এর কন্যা ফাতিমা এর সাথে তার পুত্র আলী বিবাহ বন্ধন এ আবদ্ধ হন। মুহাম্মাদ(সাঃ)চাচী ফাতিমার জন্য মাঝে মাঝে উপঢৌকন পাঠাতেন।

ফাতিমার মৃত্যুর পর মুহাম্মাদ (সা) নিজের জামা দিয়ে তাকে কাফন দিয়েছেন। তার কবরে নেমে তার পাশে শুয়েছেন। আস সামহুদী উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ (সা) মাত্র পাঁচজনের কবরে নেমেছিলেন তার মধ্যে ফাতিমা বিনতে আসাদ অন্যতম।

কবি আল হাজ্জাজ ইবনে ইলাত আস সুলামী উহুদ যুদ্ধে হযরত আলীর বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করতে গিয়ে তার মায়েরও প্রশংসা করেন।

সাহাবাগণ ফাতিমাকে সম্মান করতেন। জাফর ইবনে আবি তালিব মুতার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর কবি আহসান ইবনে সাবিত কবিতায় আলী ও তার মায়ের প্রশংসা করেন।

আরব সমাজে তখন ফাতিমা খুব জনপ্রিয় নাম ছিলো। মুহাম্মাদ এর যুগেই ফাতিমা নামে ২৪ জন মহিলা সাহাবী ছিলেন। এর মধ্যে ফাতিমা বিনতে আসাদও মুহাম্মাদ থেকে ৪৬ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি মুত্তাফাক আলাইহি।

হজরত উম্মে আয়মান রা.

হজরত উম্মে আয়মান রা এর নাম ছিল বারাকাহ।তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাসী ছিলেন। অঅত্যন্ত ভালোবাসা নিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেবা করে গেছেন।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মা বলে সম্বোধন করতেন এবং বলতেন ইনি আমার পরিবারের মানুষ। তিনি তাকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

উম্মে আয়মান রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের পূর্বে থেকে মা আমিনার সাথে থাকতেন।তিনিই রাসুলকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন।পরবর্তী সময়ে রাসূল সাঃ এর সাথে খাদিজাতুল কুবরা রা এর বিয়ের পর রাসূল সাঃ তাকে বলেন,উম্মি! আমাকে দেখাশোনার জন্য এখন খাদিজা আছে।এবার আপনাকে বিয়ে করতেই হবে।

পরবর্তীতে তার উবাইদ ইবনে জায়েদের সাথে বিয়ে হয় এবং তার একটি পুত্র হয় যার নাম আয়মান।তার স্বামী হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হলে পরবর্তীতে তার বিয়ে হয় যায়েদ ইবনে হারিসা রা এর সাথে। এই ঘরেই জন্ম হয় উসামা বিন যায়েদ রা যিনি একজন সম্মানিত সাহাবি ছিলেন। হজরত উম্মে আইমান রা উহুদ ও খায়বারের যুদ্ধে আহত, অসুস্থ মুজাহিদদের চিকিৎসা ও পানি পান করানোর সেবা দিয়েছেন।

হজরত উম্মে আয়মান রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন হজরত আনাস ইবনে মালেক রা হানাশ ইবনে আব্দুল্লাহ সানআনী,আবু ইয়াজিদ মাদানীসহ আরো অনেকেই।তিনি হজরত উসমান রা এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন।

হজরত উম্মুল দারদা আল কুবরা রা.

হজরত উম্মুল দারদা আল কুবরা রা এর নাম ছিল হুজাইমিয়্যাহ আওসাবিয়্যাহ।তিনি আবুদ দারদা রা এর স্ত্রী। তিনি বড় একজন আলেমা,ফকিহা,ফাযেলা, বুদ্ধিমতী,আবেদা ও যাহেদা মহিলা ছিলেন। ইমাম বার রহ. লিখেন,

و كانت من فضلاء النساء وعقلاءهن و ذوات الراى منهن مع العبادة و النساء

তিনি ইবাদত-বন্দেগীর পাশাপাশি একজন বুদ্ধিমতী ও প্রজ্ঞাবান নারী ছিলেন। (আল ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব)

ইমাম যাহাবী রহ. হজরত উম্মুল দারদা রা. কে সাহাবিদের মাঝে হাফেজে হাদিসদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন। তিনি তাযকিরাতুল হুফফাযে লিখেন,

كانت فقيهة عالمة عابدة مليحة جميلة و اسعة العلم وافرة العقل

তিনি একজন ফকিহা,আলেমা,আবেদা ও রূপবতী নারী ছিলেন এবং তিনি অনেক জ্ঞানী বুদ্ধিমতী ছিলেন। (তাযকিরাতুল হুফফায,খ:১ পৃ:৪৪)

উম্মে দারদা রা জেরুজালেমে উমায়্যাহ মসজিদে দারস দিতেন।তার দারসে অনেক ইমাম,ফকিহ,জূরিবর্গ এবং মুহাদ্দিসগণ বসতেন।এমনকি খলিফা আব্দুল মালিক বিন

মারওয়ান যিনি তার শাসনামলে স্পেন থেকে ইন্ডিয়া পর্যন্ত শাসন করেছেন।তিনি নিজেও আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি পেয়েছেন, যিনি তার সময়ে মদিনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহ ছিলেন।সেই আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ও উম্মুল দারদা রা এর দারসে বসতেন এবং তার থেকে শিক্ষা লাভ করতে কখনো লজ্জা বোধ করতেন না।

তিনি আপন স্বামী আবু দারদা রা,হজরত সালমান ফারসি রা ও হজরত আয়েশা রা থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, মাকহুল শাম, সালেম ইবনে আবু জাআদ, যায়েদ ইবনে আসলাম,ইসমেইল ইবনে ওবায়দুল্লাহ, আবু হাযেম্মাদনী,আতা কাইখারানী,এবং আরো কয়েকজন। (তাযকিরাতুল হুফফায,খ:১ পৃ:৫০)

হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা.

হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা, এর মা হলেন উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা। এজন্য তাকে যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রা ও বলা হয়।হজরত আসমা বিনতে আবু বকর রা তাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি তাকে দুধ পান করিয়ে ছিলেন।

হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা মদিনার ফকিহদের মধ্যে বিশেষ মান ও মর্যাদা রাখতেন। প্রসিদ্ধ তাবেয়ি আলেম আবু রাফে রহ. বলেন,

كنت اذا ذكرت امراة بالمدينة فقيهة ذكرة زينب بنت ابي سلمة

আমি মদিনার কোনো নারী ফকীহের কথা উল্লেখ করলে প্রথমেই যায়নাব বিনতে আবু সালামার কথা উল্লেখ করি।(তাহযীবুত তাহযীব,খ:১২,পৃ:৪২১)

তিনি আরো বলেন যে,একদিন আমি কোনো কারণে আমার স্ত্রীর উপর রেগে গেলাম।এবং কথায় কথায় হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা এর নাম মুখে এসে গেলো।

তখন আমার স্ত্রী বললেন,

زينب بنت ام سلمة و هي يومئذ افقه امراة بالمدينة

তিনি ছিলেন সে যুগে মদিনা মুনাওয়ারায় সবচেয়ে বড় ফকিহ মহিলা।(তাহযিবুত তাহ্যিব খ:১২, পৃ:৪২২)

হজরত যায়নাব বিনতে আবু সালামা রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনিন হজরত উম্মে সালামা রা, হজরত আয়েশা রা, হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা ও হজরত উম্মে হাবিবাহ রা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ,মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা,হুমাইদ ইবনে নাফে মাদানি, ইরাক ইবনে মালেক, উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের, আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান,কুলাইব ইবনে ওয়ায়েল,আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী যায়নুল আবেদিন,আবু কিলাবাহ জারমিসহ আরো অনেকে।তিনি ৭৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

হজরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রা.

হজরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রা হজরত আলী রা এর আপন বোন।তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তার স্বামী হুবাইরাহ ইবনে আবু ওয়াহাব নাজরানে পালিয়ে যান।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তিনি এভাবে অসম্মতি জানান,

يا رسول الله،لانت احب الي من سمعي و بصري و حق زوجي عظيم،و انا اخشي ال اضيع حق الزوج

হে আল্লাহর রাসুল!আপনি আমার কাছে আমার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। কিন্তু স্বামীর হক অনেক বড়,আমার ভয় লাগে স্বামীর হক যদি আমি আদায় করতে না পারি।(আল ইসবাহ খ:৮, পৃ:২৮৭)

হজরত উম্মে হানী রা হজরত আলী রা এর খেলাফত কাল পর্যন্ত বেচে ছিলেন। কুতুবে সিত্তায় তার বর্ননায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক হাদিস এসেছে।তার থেকে বর্ণনা করেছেন তার পুত্র জাআদাহ ইবনে হুবায়রাহ,দ্বিতীয় নাতি হারুন,উভয় গোলাম আবু মুররাহ এবং আবু সালেহ,আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস,আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নাওফাল হাশেমী,আব্দুর রহমান ইবনে আবু ইয়ালা,মুজাহিদ, উরবাহ রা, এছাড়াও শা'ব,আতা,কুরাইব,মোহাম্মাদ ইবনে উকবাহ ইবনে আবু মালেক প্রমুখ। (তাহযিবুত তাহযিব খ:১২, পৃ:৪৮১)

হজরত উম্মে ফজল লুবাবাহ বিনতে হারেস হেলালী রা.

হজরত উম্মে ফজল লুবাবাহ আল কুবরা বিনতে হারেস ইবনে হাযন হেলালী রা. উম্মুল মুমিনিন হজরত মাইমুনা রা এর আপন বোন ও হজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা এর স্ত্রী ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা এর খালা।একটি বর্ণনা অনুযায়ী তিনি উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজাতুল কুবরা রা এর পর মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বলা হয় যে তিনি হুসাইন রা এর দুধমাতাও ছিলেন।

তার গর্ভে জন্মগ্রহন করেন হজরত আব্বাস রা এর পাঁচজন আদর্শ পুত্র। ফযল,আব্দুল্লাহ,মা'বাদ,কাসাম ও আব্দুর রহমান। ফযলের সাথে সম্পৃক্ত করেই হজরত লুবাবাহ রা এর উপনাম উম্মে ফযল এবং হজরত আব্বাস রা এর নাম আবুল ফযল।উম্মে ফযল রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচী।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তার ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন ও বিস্রাম করতেন।

وروت عنه احاديث كثيرة،و كانت من المنجبات

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার সন্তানগণ অত্যন্ত ভদ্র ছিলো। (আল ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব,খ:২,পৃ:৭৭৯)

আরাফাতের দিন সাহাবীদের মাঝে সন্দেহ হলো যেরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রেখেছেন কিনা? এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সবাই উম্মে ফযল রা এর কাছে গেলেন।তখন তিনি বুদ্ধি করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে দুধ পেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম দুধটুকু পান করে নিলেন।এবং সবাই বুঝতে পারলো যে,তিনি রোজা রাখেননি।

তিনি রাসুল সা থেকে ৩০ টির মতো হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন । বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ১টি, এককভাবে বুখারী ও মুসলিমে ১টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।আর তার কাছ থকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা, কুরাইব মাওলা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তাম্মাম,তার আজাদকত গোলাম উমাইর ইবনে হারেস,আনাস ইবনে মালেক, কাবুস ইবনে আবু মুখারিক,আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নাওফাল রা প্রমুখ।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ছিলেন নবীজি (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবি, মুহাদ্দিস ও সুবক্তা। মদিনার নারীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। মদিনার নারীরা তাঁকে প্রতিনিধি হিসেবে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠায় এবং তিনি তাঁর কথা শুনে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন। আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি সাআদ বিন মুয়াজ (রা.)-এর চাচাতো বোন।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) মদিনায় নিযুক্ত মহানবী (সা.)-এর কোরআনের শিক্ষক মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাবাকাতে ইবনে সাআদের বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন নবীজি (সা.)-এর কাছে বাইআত গ্রহণকারী তিন নারীর মধ্যে একজন। তিনি নিজেও বলতেন, 'নারীদের মধ্যে আমিই নবী (সা.)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করি। '

একবার মদিনার নারীরা আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.)-কে নিজেদের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি বানিয়ে নবীজি (সা.)-এর দরবারে প্রেরণ করেন। তিনি নবীজি (সা.)-এর কাছে এমন সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় নিজেদের দাবি উত্থাপন করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা শুনে সাহাবিদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমা বিনতে ইয়াজিদের আগে তোমরা কি কোনো নারীকে দ্বিনের ব্যাপারে এর থেকে উত্তম প্রশ্ন করতে শুনেছ? তারা বললেন, না। (মারিফাতুস সাহাবা, হাদিস : ৭৫১২)

কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ

হাদিসের ব্যাখ্যাকাররা বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিবাহবিচ্ছেদের পর নারীদের 'ইদ্দত' পালন করার রীতি ছিল না। অতঃপর আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) তালাকপ্রাপ্তা হলে আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন ঋতুস্রাবকাল নিজেদের বিরত রাখবে। ' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮)

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ইদ্দত পালনকারী নারী।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ঐতিহাসিকরা তাঁর তিনটি বিশেষ প্রতিভার বর্ণনা দিয়েছেন—

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু ও সুবক্তা। আল্লামা ইবনে আসির (রা.) তাঁর 'উসগুল গাবাহ' গ্রন্থে এই নারী সাহাবিকে 'খাতিবাতুন নিসা' বা নারীদের বক্তা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর জীবনী রচয়িতা বলেন, তিনি হাদিস বর্ণনার পাশাপাশি নারীদের উপদেশ দিতেন, তাদেরকে দ্বিনি বিধি-বিধান শেখাতেন।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সাহসী নারী। তিনি নবীজি (সা.)-এর সঙ্গে খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সফরসঙ্গী হন। উসমান (রা.)-এর হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য সাহাবির সঙ্গে তিনিও জিহাদের বাইআত গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি মদিনা থেকে শামে হিজরত করেন। সেখানে ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মূলত তিনি অন্য

নারীদের মতো যুদ্ধাহতদের সেবাযত্ন করেন। ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় তাঁবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তিনি ৯ জন রোমান সেনা হত্যা করেন।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে ৮১টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে প্রসিদ্ধ তাবেয়ি ও ইমাম মুসলিম (রহ.) ছাড়া সিহাহ সিত্তার (হাদিসের বিশুদ্ধতম ছয় গ্রন্থ) সব ইমাম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ ছিলেন সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ। নারীরা সাজসজ্জা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করত। আয়েশা (রা.) যেদিন স্ত্রী হয়ে নবীজি (সা.)-এর ঘরে আসেন, সেদিন তিনি তাঁকে সাজিয়ে দেন।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.) ৬৯ হিজরিতে খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দামেস্কের বাবুস সগিরে দাফন করা হয়।

উহুদ যুদ্ধের সময় আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা.)-এর পরিবারের একাধিক সদস্য শহীদ হন। তাঁর ভাই আম্মারা বিন ইয়াজিদ নবী (সা.)-কে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার সময় শহীদ হন। এই যুদ্ধে তাঁর পিতা ইয়াজিদ বিন সাকান, চাচা জিয়াদ বিন সাকান এবং আরেক ভাই আমির বিন জিয়াদ (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

পরিবারের এতজন শহীদ হওয়ার পরও তিনি নবীজি (সা.)-কে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন তাঁকে খুঁজে পান তিনি বলেন, 'আপনাকে দেখার পর সব দুঃখই হীন। '

হজরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রা

উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান (রা.)। বিশিষ্ট সাহাবি আনাস বিন মালিক (রা.)-এর মা। ইসলামের জন্য তিনি সর্বদা নিবেদিত ও আত্মসমর্পিত ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সেবায় তাঁর জীবন, সাধ্য, সন্তান ও পরিবারসহ সবকিছু উৎসর্গ করেন।

তার মূল নাম কী ছিল— তা নিয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়; রুমাইসা, রুমাইলা, গুমাইসা। তাঁর প্রথম স্বামী মালিক বিন নজর। উম্মে সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করলে মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে শামে চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম স্বামীর ঔরসে বিখ্যাত সাহাবি আনাস (রা.)-এর জন্ম হয়। (আসাদুল গাবাহ : ৩৪৫/৭)

উম্মে সুলাইম (রা.)-এর স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সাহাবি আবু তালহা আনসারিও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি উত্তরে বলে পাঠালেন যে,

يا ابا طلحة،الست تعلم ان اهلك الذي تعبد ينبت من الارض،ينجرها حبثي بني فلان؟ قالت:
افلا تستحيي تعبد خشبة! ان انت اسلمت فاني لا اريد منك الصداق غيره

হে আবু তালহা!তুমি কি জান যে, যে উপাস্যের উপাসনা তোমরা কর সেটা মাটি থেকে তৈরী হয় এবং অমুক গোত্রের হাবশি গোলাম সেটাকে বানায়।আবু তালহা যখন এ কথা মেনে নিলেন, তখন তিনি বললেন, তোমার লজ্জা হয় না যে,তুমি কাষ্ঠখণ্ডের পূজা কর? তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে(আমি তোমার কাছে বিয়ে বসবো)এছাড়া তোমার কাছে আমি কোনো মোহর চাই না।[উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ, খ:৭, পৃ:৩৩৩)

একথা শুনে আবু তালহা চিন্তা ভাবনা করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। উম্মে হারাম রা ছেলেকে বলেন, আবু তালহার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর।তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অনেক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। সাহাবিদের জীবন নিয়ে রচিত কিতাব উসদুল গাবায় তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, و كانت من عقلاء الناس তিনি খুব জ্ঞানী ছিলেন।(উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ, খ:৫,পৃ:৫৯১)

হজরত আবু তালহা আনসারীর ঔরসে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা আনসীর জন্ম হয়, যার সন্তানদের মধ্যে অনেক বরকত হয়েছিল। তার দশজন ছেলে ছিলো। সবাই আলেম ও মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন এবং সবাই দীনের প্রচারক ও সেবক ছিলেন। হজরত উম্মে সুলাইম রা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এবং তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার পুত্র আনাস বিন মালেক

রা,আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা, আমর ইবনে আসেম আনসারী রা,আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা। (তাহ্যীবুত তাহযীব, খ:১২,পৃ:৪৭১)

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান আনসারীয়্যাহ রা

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.)। এই নারী সাহাবি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌ-যোদ্ধা ছিলেন। সাইপ্রাসের বুকে প্রথম শহীদ ছিলেন তিনি। তার কবর আজও তার শৌর্যের সাক্ষী হয়ে আছে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই নারী ভয়-ভীতি ও বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ও শঙ্কাঘেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। দীর্ঘ যাত্রার শত কষ্ট-যাতনা সহ্য করেছেন।

উম্মে হারাম ছিলেন মদিনায় সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। মদিনার বিখ্যাত খাজরাজ গোত্রের অধিবাসী। বিখ্যাত নারী সাহাবি উম্মে সুলাইম (রা.)-এর বোন। সাহাবি আনাস বিন মালিক (রা.)-এর খালা। উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর স্ত্রী।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সে সময় আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্র, দল-উপদল আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। বনু নাজ্জার গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সাক্ষাৎ করেন উম্মে হারামের বোন হারাম বিনতে মিলহান ও স্বামী উবাদা ইবনে সামিত।

মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাদের অন্তরে রেখাপাত করে। আল্লাহতায়ালা তাদের হৃদয়ের পর্দা উন্মোচিত করেন। তারা কোরআন শুনে পরিতৃপ্ত হন। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনেন। কোরআনের কোনো আয়াত তারা ইমানি আবেগে উদ্বুদ্ধ হলে গল্পের আসরে তারা এসব নিয়ে আলোচনা করতেন।

আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর উম্মে হারামের ভাই ও স্বামী বাড়ি ফেরার পর উম্মে হারাম ও তার বোন উম্মে সুলাইম তাদের মুখে কোরআনের কিছুসংখ্যক আয়াত শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী (সা.) যখন মদিনার অনতিদূরের কুবায় অঞ্চলে যেতেন, তখন তিনি উম্মে হারামের বাড়িতে উঠতেন। উম্মে হারাম রাসুল (সা.)-এর যথাসাধ্য সেবাযত্ন ও মেহমানদারি করতেন। একদিন রাসুল (সা.) তার বাড়িতে মেহমান হলেন। খাবারপর্ব সেরে রাসুল (সা.) একটু ঘুমালেন। ঘুম থেকে উঠেই আল্লাহর রাসুল হাসতে লাগলেন। উম্মে হারাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি হাসছেন কেন? রাসুল (সা.) বলেন, 'আমার কাছে এমন কিছু যোদ্ধা পাঠানো হয়েছে, যারা এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ করবে।' উম্মে হারাম বললেন, আমার জন্য দোয়া করুন, আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসুল নিজের মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠেই হাসলেন। উম্মে হারাম হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে আল্লাহর পথের যোদ্ধাদের পাঠানো হয়েছে। উম্মে হারাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্যও দোয়া করুন, যেন আমি তাদের একজন হতে পারি। তদুত্তরে রাসুল (সা.) বললেন, তুমি তাদের প্রথম সারির একজন।

ইমাম আব্দুল বার রহ লিখেন,

و كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يكرمها و يزورها في بيتها،و بقيل عندها،و دعا لها بالشهادة

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্মান করতেন।তার বাড়িতে যেতেন, সেখানে বিশ্রাম করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য শাহাদাতের লাভের দোয়া করেছিলেন। (আল ইস্তয়াব খ:৪,পৃ:১৯৩১)

দ্বীনের প্রতি মমতা, ভালোবাসা তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহতায়ালা তার মতো ওইসব নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা দ্বীন-ধর্মের জন্য এমন চিন্তা-আদর্শ লালন করেছেন। কারণ তারা মহানবী (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, হজরত আনাস ইবনে মালেক রা, ওমর ইবনে আসওয়াদ

আনসী,ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আউস,আতা ইবনে ইয়াসার রা।(তাহযীবিত তাহয়ীব, খ:১২, পৃ:৪৬২)

প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগনের সফলতার পিছনে তাদের মায়েদের অবদান

ইমাম মালেক রে.-এর আম্মা

ইমাম মালেক রহ.-এর আম্মা ছিলেন আলিয়া বিনতে আব্দুর রহমান ইবনে শরীক আযদী রহ.।তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদ্যান নারী ছিলেন। তিনি আপন পুত্র মালেকের শিক্ষা দীক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। ইমাম মালেক রহ বলেন, আমি আমার মা-কে বললাম যে,আমি দীনি আমি দীনি শিক্ষা অর্জন করবো।তখন আমার মা আমাকে আলেমদের পোশাক মাথায় টুপি ও পাগড়ি পরিয়ে দিলেন এবং বললেন-।

ذهب الي ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه

রাবিয়াতুল রায়ের মজলিসে যাও এবং প্রথম তার শিষ্ঠাচার এবং আদব শিক্ষা কর।অতঃপর তার ইলম শিক্ষা করো।(তারতিবুল মাদারেক ওয়া তাকরিবুল মাসালেক,খ:১,পৃ:১৩০)

আরেকটি বর্ণনায় আছে তিনি বলেছিলেন-اذهب فكتب الان।যাও এখন হাদীস লিখ,পড়।

সেই সময় ইমাম রাবিয়াতুর রায় মসজিদে নববিতে দারস দিতেন।এবং মদিনার বড় বড় আলেম এবং বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ তার দারসে উপস্থিত থাকতেন।এ জন্য তার মা তার শিক্ষা দিক্ষার জন্য তার মজলিসকেই নির্বাচন করেছিলেন। এবং এখান থেকেই তার পুত্র ইমাম মালেক হয়ে বের হয়েছেন।

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ.-এর আম্মা

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ তাবে তাবেয়িনের যুগের অনেক বড় একজন আলেম ও ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উস্তাজ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ বলেন, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ না থাকলে হেজায থেকে ইলম বিদায় হয়ে যেত।ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ এর মা তাকে যেভাবে ইললে দ্বিন শিখিয়েছেন তা এ যুগের মায়েদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয়।ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রহ বলেন, ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ এর মা তাকে বলেন

يا بني اطلب العلم و انا اكفيك من مغزلي يا بني اذا كتبت عشرة احاديث فانذر هل تري في نفسك زيادك في مشيتك و حلمك ووقارك فان لم تر ذلك فاعلم انه لا يضرك و لا ينفغك

হে আমার পুত্র! তুমি ইলমে দ্বিন অর্জনে নিমগ্ন থাকো।কাপড় বুনে তোমার যাবতীয় খরচ নির্বাহ করতে আমিই যথেষ্ট। হে আমার পুত্র! তুমি দশটি হাদিস শিক্ষা করে নিজেকে যাচাই করে দেখো যে,তোমার চালচলন, আদব আখলাক,মন-মেজাযে ও চিন্তা চেতনায় কোনো পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে কি না? যদি দেখ যে, কোনো উন্নতি হয়নি তাহলে ধরে নিবে যে, এই শিক্ষা তোমার কোনো কাজেই আসলো না। না উপকার করলো না ক্ষতি করলো। (তারীখে জুরজান,পৃ:৪৪৯)

মায়ের সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি বড় বড় আলেমদের থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি প্রায় আশিজন তাবেয়ি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এক সময় তিনি নিজেই হাদিসের বড় একজন আলেম হিসেবে স্বিকৃতি লাভ করেন।এবং বহু মানুষ তার থেকে দ্বিনী ইলম অর্জন করেন।

নযর হেলালি রহ বলেন, একবার আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ এর দরসে উপস্থিত ছিলাম,তখন ছোট একটি বাচ্চা সেই মজলিসে আসলো। মজলিসের উপস্তিত লোকজন তাকে(বয়স কম হওয়ার কারণে) তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছিল। তখন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ তাদেরকে বললেন,তোমরাও তো একদিন এমনই ছিলে,আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে তোমরা এখন বড় হয়েছো।অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে

বললেন,হে নযর!তুমি যদি আমার এই বয়সে আমাকে দেখতে তাহলে তুমি আশ্চর্য বোধ করতে। তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। আমি ছোট বালক ছিলাম। মার চেহারাটাও ছিল ছোট।আমার জামা জুতা সবই ছিল ছোট ছোট। ছোট দোয়াত কলম ব্যবহার করতাম। সেই তখন থেকেই আমি বিভিন্ন শহরের বড় বড় আলেমদের (যেমন ইবনে শিহাব যুহরি ও আমর ইবনে দিনার)দরসে এবং মজলিসে যেতাম। মজলিসে লোকজন আমাকে দেখে বলতো,এই ছোট হুজুরকে জায়গা করে দাও। (আল কেফায়াহ,পৃ:৬০,৬১)

ইমাম আওযায়ি রহ এর আম্মা

শাইখুল ইসলাম ইমাম আওযায়ি রহ এর নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে আমর ইবনে মুহাম্মদ আওযায়ি।তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অনেকে তার মাজহাবের অনুসরণ করতো। তার বর্ণিত মাসআলার সংখ্যা আশি হাজার। তিনি অনেক বড় বুজুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। আর এই সব কিছু হয়েছিল তার মায়ের অবদানে,কারণ তিনি এতিম ছিলেন, মায়ের কাছেই বড় হয়েছেন এবং মায়ের তত্ত্বাবধানেই ইলমে দ্বিন অর্জন করে এত বড় ইমাম হয়েছেন। তার জীবনিতে বলা হিয়েছে,

ولد بعلبك و ربي يتيما فقيرا في حجر امه،تعجز الملوك ان تؤدب اولادها ادبه في نفسه

তিনি বা'লাবাক নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মায়ের কোলে এতিম ও দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে প্রতিপালিত হন,কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দিক্ষা লাভ করেছিলেন সেটা অনেক রাজা বাদশার সন্তানর' পায় না।(তাযকিরাতুল হুফফায,খ:১,পৃ:১৬৯)

এক বর্ণনায় আছে তিনি বা'লাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কারক নামক এলাকায় প্রতিপালিত হন,তারপর তার মা তাকে বৈরুতে নিয়ে যান।এবং সেখানেই তার মায়ের ইন্তেকাল হয়।বিভিন্ন কিতাবে ইমাম আওযায়ির বহু মানাকেব ও ফাজায়েল বর্ণিত আছে।

কথায় কথায় তিনি চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসাতেন।খোদা ভীতি ও মৃত্যুর স্মরণে তার অন্তর টইটম্বুর ছিলো। তার মা তাকে মুসল্লায় কোন অবস্থায় আছেন পর্যবেক্ষন করতেন । নামাজ শেষে তিনি যখন বের হতেন তখন তার মা দেখতে পেতেন সিজদার স্থানটি চোখের পানি দ্বারা ভিজে গেছে।তার মায়ের এমন তরবিয়তের কারণেই তিনি এতো বড় বুজুর্গ ব্যাক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

ইমাম ইবনে উলাইয়াহ রহ এর আম্মা

ইমাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মিকসাহ বসরী ইবনে উলাইয়াহ রহ অনেক বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন।উলাইয়াহ তার মায়ের নাম।মায়ের নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তার দাদা মিকসাহ সিন্ধের কায়কান এলাকায় বন্দী হয়ে আব্দুর রহমান ইবনে আসাদ ইবনে কুত্ববা আসবির কৃতদাস হয়ে যান।আর তার বাবা কুফায় কাপড়ের ব্যবসা করতেন, এই সুত্রেই তিনি বসরায় যাওয়া আসা শুরু করেন।যিনি শায়বান গোত্রের কৃতদাসী ছিলেন। তার বিষয়ে ইবনে সাদ আততাকাআতুল কুবরা গ্রন্থে লিখেন,

و كانت امراة عاقلة برزة لها دار بالعوقة بالبصرة تعرف بها. و كان صالح المري و غيره من وجوه اهل البصرة و فقهاءها يدخلون عليها فتبرز لهم و تحدثهم و تساءلهم.

তিনি বড় সম্মানীত, জ্ঞানী, মেধাবী নারী ছিলেন। বছরার উক্কা মহল্লায় এক জায়গা তার নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। বসরার ছালেহ মুররী এবং বড় বড় ফকীহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর ওখানে যেতেন। পর্দার আড়াল থেকে তিনি তাঁদের সঙ্গে দ্বীনী ও ইলমী মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতেন।(তবকাতে ইবনে সাদ,খ:৭,পৃ:১৯৬)

এই আলেমা ফাযেলা নারীর গর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করেন (১১০ হি.) ইমাম ইসমাঈল বছরী। যিনি মায়ের তা'লীম ও তরবিয়াত-এর মাধ্যমে ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীনের ইমাম হয়ে গেছেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবদুল ওয়ারিস বর্ণনা করেন, উলায়্যাহ বিনতে হাসসান তাঁর ছেলে ইসমাঈলকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। সে অনেক সুশ্রী ছিল। বললেন, আমার এই

ছেলেটি আপনার কাছে থাকবে। আপনার থেকে আখলাক শিখবে। ইমাম আবদুল ওয়ারিস বর্ণনা করেন, আমি তাকে আমার কাছে রাখলাম। যখন কোনো আহলে ইলমের মজলিসে যেতাম, তখন তাকে আগে প্রেরণ করতাম, তারপর আমি মজলিসের শায়খের কাছে যেতাম।

এই আলেমা ফায়েলা নারীর গর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করেন (১১০ হি.) ইমাম ইসমাঈল বছরী। যিনি মায়ের তা'লীম ও তরবিয়াত-এর মাধ্যমে ফুকাহা এবং মুহাদ্দিসীনের ইমাম হয়ে গেছেন।

সেই যামানায় গোলাম-বাঁদি পর্যন্ত ইলমে দ্বীন সম্পর্কে এত উঁচু পর্যায়ের রুচি রাখতেন! তাদের ইলমী এবং দ্বীনী জিন্দেগীও ছিল অনেক উঁচু মানের।প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবরাহিম হারবী রহ বলেন –

فخرج ابن عليه و اهل البصرة لا يشكون انه اثبت من عبد الوارث

যখন ইমাম ইবনে উলাইয়াহ (ইমাম আব্দুল ওয়ারিস রহ এর নিকট থেকে শিক্ষা দিক্ষা অর্জন করে বের হলেন)তখন বসরার লোকেরা সকলেই এই স্বীকৃতি দিলো যে,তিনি (হাদীসের বিষয়ে) ইমাম আবদুল ওয়ারিসের থেকেও বেশি অধিক নির্ভরযোগ্য।(তারিখে বাগদাদ,খ:৬,পৃ:২৩১)

সেই যামানায় গোলাম-বাঁদি পর্যন্ত ইলমে দ্বীন সম্পর্কে এত উঁচু পর্যায়ের রুচি রাখতেন! তাদের ইলমী এবং দ্বীনী জিন্দেগীও ছিল অনেক উঁচু মানের।তাই সেসময়কার সমাজ শিক্ষা দিক্ষায় কত উন্নত ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

উলায়্যাহর তিন সন্তান ছিল। ইসমাঈল, হাম্মাদ, মুহাম্মাদ। মায়ের দিকে নিসবত করে তাদের ইবনে উলায়্যাহ ডাকা হত। তিন ভাই-ই মায়ের উন্নত তরবিয়তের ফলে যামানার প্রসিদ্ধ আলেম-ফাযেল হিসেবে বরিত হয়েছেন। (তারিখে বাগদাদ ৫/১৭১)

ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জায রহ এর আম্মা

ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জায ওয়াসেতি বসরী রহ একজন তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হজরত আনাস ইবনে মালেক রা ও হজরত আমর ইবনে সালামাহ রা কে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায় চারশত তাবেয়ি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।তার মায়ের নাম শুমায়সা উম্মে সালামাহ। তিনি হাদিসশাস্ত্রে শিক্ষিতা ছিলেন। তার মা একজন আলেমা ফাযেলা ছিলেন।তিনি ইমাম শু'বা রহ কে বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট পাঠাতেন শিক্ষা অর্জন করার জন্য। নিজের সন্তানের শিক্ষা দিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন।ইমাম শ'বা রহ বলেন,

قالت لي امي هاهن امراة تحدث عن عاءشة فاذهب فاسمع منها

একবার আমার মা আমাকে বলেন, অমুক জায়গায় একজন মহিলা আয়েশা রা এর সুত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, তুমি তার কাছে গিয়ে হাদীস শুনো।(তবাকাতে ইবনে সাআদখ:৭, পৃ:২০৭)

আমি আমার মায়ের কথামতো সেই মহিলার কাছে গিয়ে হজরত আয়েশা রা থেকে বর্ণিত হাদিস শ্রবণ করি এবং মাকে এসে বলি যে,আমি সেই মহিলার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছি। তখন মা বললেন,এখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে ইলম অর্জনের বিষয়ে অবহেলার কারণে তোমাকে প্রশ্নের মুখামুখি হতে হবে না।(তবাকাতে ইবনে সাআদ খ:৭, পৃ:২০৭)

ইমাম শু'বা ইবনে হাজ্জায রহ এর মা তার বাবার মৃত্যুর পর দুইবার বিয়ে করেন।তার শেষ স্বামী ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তিনি ইমাম শু'বা ও তার বাকি তিন ভাইয়ের দেখাশোনা করেন।শু'বা সারাজীবন কামাই রোজগারের পিছনে সময় নষ্ট করেননি।তার বাকি তিন ভাই তার ও তার পরিবারের দেখাশোনা ও ভরনপোষণ করেন যেন তিনি তার সমস্ত সময় ইলম অর্জনের পিছনে ব্যয় করতে পারেন। (shu'bah ibn hajjaj,the “king of had ith”;ARAB NEWS)

যে মানুষের মা হাদিস সম্পর্কে এতো উচ্চ দৃষ্টি রাখতেন তার সন্তান কেনই বা যুগশ্রেষ্ঠ একজন ইমাম হবেন না! ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ তার সম্পর্কে বলেছেন, শু'বা রিজাল শাস্ত্র ও হাদিস শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ বলেন,তিনি ছিলেন 'আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস '।

ইমাম শাফেয়ী রহ এর আম্মা

ইমাম শাফেয়ী রহ এর নাম মোহাম্মাদ ইবনে ইদ্রিস ইবনে আব্বাস।তার মায়ের নাম ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব।ইমাম শাফেয়ী রহ এর মা বলেন,শাফেয়ী যখন আমার গর্ভে ছিল তখন একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে,আমার শরীর থেকে বৃহস্পতি গ্রহ বের হয়ে মিসরে গিয়ে পড়লো।যার আলো সব শহর নগর আলোকিত করে দিলো।তার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হয় যে,তার গর্ভথেকে এমন আলেম জন্ম নিবে যার জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাবে মিসর থেকে সারা বিশ্বে।

ইমাম শাফেয়ী রহ এতিম ছিলেন।তার পিতা তার জন্মের আগেই কিংবা জন্মের পরপরই ইন্তেকাল করেন। তখন তার মা-ই তার লালন পালন ও শিক্ষা দিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন।শাফেয়ী রহ.-এর বর্ণনা হলো যে,আমি এতিম ছিলাম। আমার মা-ই আমাকে লালনপালন ও মানুষ করেন।১৫০ হিজরীতে শামের একটি শহর গাযযায় আমি জন্মগ্রহণ করি।দুই বছর বয়সে আমাকে মক্কা মুকাররমায় নিয়ে যাওয়া হয়।

তিনি তাঁর ছেলেকে কুরআন মুখস্থ করানোয় মনোনিবেশ করান এবং ৭ বছর বয়সে ইমাম শাফেয়ী সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। এর পাশাপাশি ইমাম শাফেয়ী বিভিন্ন মসজিদে ঘুরে আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে বিভিন্ন হাদীস ও মাসআলা মুখস্থ করতে শুরু করেন । এর কিছু বছর পরেই তিনি তাঁর মায়ের সাথে মক্কায় পাড়ি জমান । ইমাম শাফেয়ী ছোটবেলা থেকেই শিক্ষানুরাগী এবং কঠোর জ্ঞান সাধনা করার ফলে ৭ বছরে কুরআনের হাফেয এবং ১০ বছরে মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থ (ইমাম মালিকের

"মুয়াত্তা" সর্বপ্রথম প্রামান্য হাদীসগ্রন্থ) হিফয করে ১৮ বছর বয়সে থেকে ফতোয়া প্রদান শুরু করেন। সাথে সাথে মক্কায় আরবী পণ্ডিতদের কাছে আরবী কবিতা ও ভাষা জ্ঞানে পূর্ণ পান্ডিত্ব লাভ করেন।

অন্য একটি সুত্রে বর্ণিত আছে, তিনি আসকালানে জন্ম নিয়েছেন। তিনি বলেন,আমাকে আমার আম্মা মক্কা মুকাররমায় নিয়ে যান।আম্মার কাছে অর্থকড়ি ছিলো না।যার কারণে তিনি মক্তবের আমার পড়ার খরচ দিতে পারতেন না।অবশেষে উস্তাজ মক্তবের কোনো খরচ ছাড়া আমাকে পড়াতে রাজি হলেন এভাবে যে,তিনি যখন মাদরাসায় উপস্থিত থাকবেন না তখন আমি বাচ্চাদের সবক পড়িয়ে দিব।আমি উলামা ও মুহাদ্দিসদের দরসে হাদিস ও মাসায়েল শুনে শুনে মূখস্ত করে নিতাম,কারণ আমার মায়ের কাছে এই পরিমাণ অর্থ ছিলো না যে, কাগজ কলম সংগ্রহ করে দিবেন আর আমি তাতে লিখবো। যার কারণে এদিক সেদিক থেকে হাড্ডি,মাটির পাত্রের ভাংগা টুকরো, খেজুরের ছাল ইত্যাদি কুড়িয়ে তাতে লিখতাম।একবার ইয়ামানে যাওয়ার প্রয়োজন হলো।কিন্তু আমার মায়ের কাছে এ পরিমান অর্থ ছিলো না যে, আমার সফরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন।অবশেষে আম্মার একটি চাদর ছিলো সেটা মাত্র ষোল দীনারের বিনিময়ে বন্ধক রেখে আমার সপরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।(মুখতাসার সাওয়ানেহে আইম্মায়ে আরবাআ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর আম্মা

হজরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল শায়বানী বাগদাদী রহ.-এর মায়ের নাম সাফিয়্যাহ বিনতে মাইমুনাহ বিনতে আব্দুল মালিক শায়বানী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ মাত্র তিন বছর বয়সে এতিম হয়ে যান।তিনি বলেন, আমি আমার দাদা ও পিতাকে দেখিনি। আমার মা-ই আমাকে লালনপালন করেছেন।

তার মা তাকে খুব আদর সোহাগ দিয়ে লালনপালন করেন এবং তার উন্নত শিক্ষা-দিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তার লালন পালন ও শিক্ষা-দিক্ষার মান এতই উন্নত ছিল

যে, সে যুগের উচ্চ শ্রেণির লোকেরাও তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন। তাঁর আদব, বিনয়, সততা, সুমিষ্ট ব্যবহারের কারণে সবাই তাঁকে অন্য কিশোরদের চাইতে আলাদা দৃষ্টিতে দেখতেন। সমবয়সী ছেলেদের পিতার কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ স্বরূপ। একজন পিতা আফসোস করে বলত, আমি আমার সন্তানদেরকে পড়ানোর জন্য বাসায় শিক্ষক রেখেছি। কিন্তু তারা তো তেমন ভালো করতে পারে নি। অথচ দেখো আহমাদ ইয়াতিম হওয়া সত্ত্বেও কেমন এগিয়ে গেছে! তাঁর জ্ঞানার্জন, ব্যবহার দুটোই প্রশংসনীয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সন্তানের সব বিষয়ে সব খোঁজখবর রাখতেন।তার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা সর্বদা তাকে সিক্ত করে রেখেছিলো। তার বয়স যখন বাইশ বছর, তখন ১৮৬ হিজরি। সে বছর দজলা, ফুরাত এলাকায় ভীষন বন্যা হয়।তখন রায় অঞ্চলের মুহাদ্দিস জারির ইবনে আব্দুল হামিদ রহ বাগদাদে আসেন।ইমাম আহমদ ইবনে আব্বাস রগ এর সাথীরা তার থেকে হাদিস শ্রবণের জন্য যান।কিন্তু তার মা তাকে যাওয়ার অনুমতি দেননি।

তিনি যদি রাতের অন্ধকারে কোনো মুহাদ্দিসের দরসে যেতে চাইতেন তাহলে তার মা তাকে আদর করে রেখে দিতেন,যেতে দিতেন না।ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ বলেন যে,আমি অনেক সময় রাতের অন্ধকারে হাদিস শ্রবণের জন্য যেতে চাইতাম,কিন্তু আমার আম্মা আমার গায়ের কাপড় টেনে ধরে বলতেন, বাবা!সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর।তবে এত কিছু সত্ত্বেও আমি রাতের অন্ধকারেই চলে যেতাম আবু বকর ইবনে আইয়াশ রহ এর দরসে।(মানাকিবুল ইমাম আহমদ, প:১৪,২৮)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ তার মায়ের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভদ্রতার আচরণ করতেন।

একবার তার মায়ের পরার মতো কোনো কাপড় ছিল না।তখন কোথাও থেকে তার জন্য কিছু যাকাতের অর্থ হাদিয়া এলো।তিনি এই বলে তা ফেরত দিলেন যে,মানুষের সম্পদের ময়লা আবর্জনা ব্যবহার করার চেয়ে বিবস্ত্র থাকাই উত্তম। দুনিয়ায় জীবন ত

সামান্য সময়ের,কিছু দিন থেকেই চলে যেতে হবে।(তবাকাতুল কুবরা লিশশারানি,খ:১৭,পৃ:১৭১)

ইমাম বুখারী রহ এর মা

তিনি ১৩ই শাওয়াল শুক্রবার, ১৯৪ হিজরীতে (৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) খোরাসানের বুখারাতে (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম। তার দাদার নাম ইব্রাহিম। তার দাদার সম্পর্কে খুব বেশি জানা না গেলেও তার বাবা ইসমাইল মুসলিম বিশ্বে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন হাদীসবিদ। তিনি হাদিস শাস্ত্রবিদ আল্লামা হাম্মাদ এবং হযরত ইমাম মালেক এর শাগরিদ ছিলেন। এছাড়াও বিখ্যাত মনীষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এর শাগরিদ ছিলেন বলে জানা যায়। সমসাময়িক যুগের আরও অনেক বুজুর্গ আলেমদের কাছ থেকে দ্বীনে ফায়েজের জাহেরি ও বাতেনি ইলম হাসিল করে সুযোগ্য আলেম ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইমাম বুখারী শিক্ষা, জ্ঞান ও যোগ্যতা শুধু পিতার দিক থেকেই পাননি বরং মাতার দিক থেকেও অর্জন করেছিলেন। ইমাম বুখারী এর মাতা ছিলেন বিদূষী ও মহীয়সী মহিলা। নেককার মহিলা হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। এ সম্পর্কে একটা ঘটনা আছে। বাল্যকালে ইমাম বুখারী এর একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ রোগের প্রভাবে তার দুই চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। স্নেহময়ই মাতা পুত্রের চোখের আলোর পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করতে থাকেন। এ পর্যায়ে এক রাত্রে স্বপ্নে তিনি হযরত ইব্রাহীম কে তার শিয়রে বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন। হযরত ইব্রাহীম আ. তাকে বলেন, তোমার প্রার্থনা আল্লাহ্ পাক কবুল করেছেন। তার দয়ার বরকতে তোমার পুত্র চোখের আলো ফিরে পেয়েছে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে তার পুত্র ইমাম বুখারী বলে উঠলেন, আম্মা! আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখ ভাল হয়ে গেছে। এ ঘটনাটিই প্রমাণ করে ইমাম বুখারী এর মাতা কত বড় মাপের বুজুর্গ মহিলা ছিলেন। ইমাম বুখারী শৈশবেই বাবাকে হারান, ফলে মায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। পিতা মারা

যাওয়ার সময় প্রচুর ধনসম্পদ রেখে যান। ফলে ইমাম বুখারীকে কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। মাতাই পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী এর বাল্যকাল থেকেই শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। ইমাম বুখারী প্রথমে কোরআন পাঠ শুরু করেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি কুরআন মুখস্থ করেন। ১০ বছর বয়স থেকে তিনি হাদীস মুখস্থ করা শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি "আবদুল্লাহ বিন মুবারক" এবং "ওয়াকীর পান্ডুলিপিসমূহ" মুখস্থ করে ফেলেন। মহান আল্লাহ্ পাক তাকে অনন্য সাধারণ স্মরণ শক্তি দান করেছিলেন।

তিনি নিজ শহরের মুহাদ্দিসিনদের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে সাল্লাম,মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মুসনাদি,মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বিকান্দি রহ প্রমুখ মুহাদ্দিসদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এবং সত্তর হাজার হাদিস মূখস্ত করে ফেলেন।সালিম ইবনে মুজাহিদ রহ বর্ণনা করেন আমি একদিন মুহাম্মদ ইবনে সুলাইম এর দরসে উপস্থিত হতে বিলম্ব করে ফেলি।তখন তিনি আমাকে বললেন,আরেকটু আগে এলে একটি বালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতে।সে সত্তর হাজার হাদিস মূখস্ত করে ফেলেছে।এরপর আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইলের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং জিজ্ঞেস করি তোমার নাকি সত্তর হাজার হাদিস মূখস্ত? সে উত্তর দিলো,জি হ্যাঁ, বরং এর চেয়েও বেশি পরিমাণ আমার মূখস্ত। (তবাকাতুশ শাফেয়্যাতিল কুবরা, খ:২,পৃ:২১৮

ইমাম বুখারী রহ. নিজ শহরের মুহাদ্দিসদের থেকে জ্ঞান অর্জন করে মা ও বোনের সাথে অন্য শহরে চলে যান।ইমাম যাহাবী রহ লিখেছেন,

و نشا يتيما و رحل مع امه و اخيه سنت عشر و ماءتين بعد ان سمع مرويات بلده

তিনি এতিম অবস্থায় লালিত পালিত হন এবং নিজ শহর থেকে হাদিস সংগ্রহ করার পর ২১০ হিজরিতে মা ও বোনের সাথে রওয়ানা হন অন্য শহরে হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

তখন তার বয়স ছিল পনেরো বা ষোলো বছর।ইমাম বুখারি মাত্র আঠারো বছর বয়সে আত তারিখুল কাবির নামক গ্রন্থটি লিখেন।তিনি বলেন, আমার বয়স যখন আঠারো

শুরু হলো তখন থেকেই আমি সাহাবা,তাবেয়ীদের জীবনী ও তাদের বানীসমূহ সংকলন করা শুরু করি এবং নবীজীর রওজা শরীফের পাশে বসে চাঁদের আলোয় কিতাবুত তারীখ লিখি।(তারীখে বাগদাদ,খ:২,পৃ:৩)

একটি বর্ণনায় আছে, তিনি তার মা ও বড় ভাইয়ের সাথে হজ করেন।হজের পর ভাই দেশে ফিরে আসেন আর তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য থেকে যান।

ইমাম বুখারী রহ এর রচিত ও সংকলিত কিতাবগুলোর মধ্যে আল জামেউস সহীহ্ ও আত তারিখুল কাবির অসাধারণ কিতাব। এসবকিছুই তার মায়ের চেষ্টা ও মনোযোগের ফসল যে,একটি এতিম ছেলে 'আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ‘এর মর্যাদায় আরোহন করেছে।

ইমাম আওকাস রহ -এর আম্মা

কাজিয়ে মক্কা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল আওকাস রহ -এর ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তার ঘাড় শরীরের ভিতর ঢুকে ছিলো। কাঁধদ্বয় মাথার উপরে উঠে ছিলো। বেঁটে বা বামন আকৃতির ছিলেন তিনি। চেহারাও তেমন সুন্দর ছিলো না।তার মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও আলেমা ছিলেন। তার এই সন্তানের ব্যাপারে তিনি খুব চিন্তা করতেন।একবার তাকে তিনি বললেন,

يا بني اتكون في قوم الا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فانه لا يرفعك

বেটা! তুমি যেখানেই যাবে মানুষ তোমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে।সুতরাং তুমি ইলম অর্জন করো, ইলম তোমাকে সম্মানিত করবে। (তারীখে দামিশক, খ:৫৪, পৃ:১০৬)

অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম আওকাস রহ বলেন, আমার আম্মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন,

يا بنيانك خلقت خلقة لا تصلح معها المعاشرة الفتيان فعليك بالدين فانه يتم النقيصة و يرفع خسيسة فنفعني الله بقولها فتعلمت الفقه فصرت قاضيا

বেটা! তোমার শরীরের গঠনটাই এমন যে,তুমি অন্য যুবকদের সাথে মিশতে পারবে না।তাই তুমি ইলম অর্জন করো,তাহলে ইলম এই ত্রুটির পরিপূরক হয়ে যাবে এবং তোমার লাঞ্ছনা দূর করে দিবে।আল্লাহ তা'য়ালা তার এই কথার প্রভাব আমার উপর ফেলেছিলেন, যার কারণে আজ আমি ফিকহ শিক্ষা করেছি এবং কাজি হয়েছি।(তারীখে দিমাশক, খ:৫৪, পৃ:১০৫)

ইমাম আওকাস রহ বিশ বছর মক্কা মুকাররমায় কাজি হিসেবে ছিলেন। তার প্রভাব এতো বেশি ছিলো যে,বিচারপ্রার্থী তার সামনে দাঁড়িয়ে কাপতে থাকতো।একবার তিনি মোনাজাতে বলছিলেন, হপ আল্লাহ! আমার গর্দানকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।এক মহিলা তার এই দোয়া শুনে বলল, ভাতিজা! তেমার গর্দানই কোথায় (যে আল্লাহ তা আগুনে পোড়াবেন)? (আল ফকীহ ওয়াল মুতা ফাক্কিহ, খ:১, পৃ:৩২)

খলিফা নাসের আব্বাসীর মা

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার পুত্র ইমাম ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী রহ এর বয়স মাত্র সতেরো বছর। পিতার ইন্তেকালের পর তার লালন- পালন ও শিক্ষা- দীক্ষার দায়িত্ব আঞ্জাম দেন খলিফা নাসের আব্বাসি এর মা আল জাহতাহ। ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী রহ জ্ঞানে গুনে পিতার মতই হয়ে উঠেন। আল জাহতাহ খাতুন রাজদরবারের নিকটেই নিয়মিত ওয়াজ মাহফিলের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যেখানে ইমাম ইবনুল জাওযী রহ জীবিতাবস্থায় সবসময় বয়ান করতেন।তার ইন্তেকালের পর তার ছেলেকেই সেই দায়িত্ব টি অর্পন করেন আল জাহতাহ খাতুন।

ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী রহ এর বয়স যখন তেইশ বছর তখন খলিফা নাসের আব্বাসী তাকে বাগদাদে পূর্ব -পশ্চিম উভয় অঞ্চলের গভর্ণর বানিয়ে দেন।এবং তাকে 'মাকবুলুশ শাহাদাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইমাম ইউসুফ ইবনুল জাওযী রহ কে আল্লাহ তায়ালা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। খলিফা ও

সুলতানদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শহরে দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।দামেশকে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তিনি তার বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। বাগদাদে হালাবিয়্যাহ নামক স্থানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।আর হারবিয়্যাহ নামক স্থানে 'দারুল কুরআন ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। শেষ বয়সে তিনি বাগদাদে মাদ্রাসায়ে মুনতান্সারিয়্যাহতে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৬৫৬ হিজরীতে তাতারদের ফেতনায় শহীদ হন।

হজরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ এর আম্মা

হযরত খাজা নিযামুদ্দীনের বয়স পাঁচ বছর হলে তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। মা সে সময়ের একজন নেককার আল্লাহওয়ালা নারী ছিলেন। এই এতীম বাচ্চার সার্বিক তত্ত্বাবধান, দ্বীনী ও আখলাকী তরবিয়তসহ পিতৃ দায়িত্বের সবটুকুই এ মাকেই কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল।

পাগড়ী গ্রহণের সময় এলে উস্তায পাগড়ী নিয়ে আসতে বললেন। খাজা নিজামুদ্দীন রাহ. মাকে বললেন, মা! উস্তায পাগড়ী নিয়ে যেতে বলেছেন; পাগড়ী কোথায় পাব? মা বললেন, বাবা অস্থির হয়ো না, আমি ব্যবস্থা করছি। অনেক কষ্টে মা পাগড়ীর ব্যবস্থা করে দিলেন। পাগড়ী গ্রহণের এই বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁর মা সময়ের বড় বড় আলেম ও বুযুর্গদের দাওয়াত করেছিলেন।

খাজা নিযামুদ্দীন বলেন, মায়ের একটি অভ্যাস ছিল, যেদিন খাবারের কোনো ব্যবস্থা থাকত না, সেদিন বলতেন, আমরা সকলেই আজ আল্লাহর মেহমান। ‘আল্লাহর মেহমান’ হওয়ার এই বোলটি আমার কাছে বেশ আনন্দের বিষয় ছিল। (কারণ আল্লাহর মেহমানকে তো আল্লাহ তাঁর শান অনুযায়ীই মেহমানদারী করাবেন।)

একদিন আল্লাহর এক বান্দা বাড়িতে এক ঝুড়ি খাদ্যশস্য দিয়ে গেল। তা দিয়ে বেশ কয়েকদিন চলল। কিন্তু এই খাদ্য শেষ হতে দেরি হওয়ায় আমার মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি

হল। কেননা এই খাবারগুলোর কারণেই মায়ের মুখ থেকে 'আল্লাহর মেহমান' হওয়ার সেই মজার বাক্যটি শুনতে পারছি না।

একসময় তা শেষ হল। এবার মা জানিয়ে দিলেন, আজ আমরা আল্লাহর মেহমান। একথা শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত হলাম।

একদিন হযরত খাজা তার মায়ের মৃত্যুর আলোচনা শুরু করলেন। একপর্যায়ে এমন কান্না শুরু করলেন যে, তাঁর কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না।

খাজা রাহ. একদা নতুন চাঁদ দেখে অভ্যাসানুযায়ী মায়ের কাছে এসে নতুন চাঁদের মোবারকবাদ জানালেন। মা তখন বললেন, আগামি মাসের চাঁদ দেখে কাকে মোবরকবাদ জানাবে? তাঁর আর বুঝতে বাকী রইল না- মায়ের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন আর তাঁর অন্তর ভারী হয়ে এল। বললেন, মা! আপনি এই অসহায়কে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? মা জবাব দিলেন, কাল বলল।

আমি মনে মনে বললাম, কী ব্যাপার! আজ জবাব দিচ্ছেন না কেন? সাথে এও বললেন, যাও আজ শায়েখ নযীবুদ্দীনের কাছে থাক। কথামত আমি তাঁর কাছে গেলাম।

শেষ রাতে সুবহে সাদিকের কিছু পূর্বে মায়ের খাদিমা দৌড়ে এসে বলল, বেগম ছাহেবা (খাজা ছাহেবের মা) তোমাকে ডাকছেন। আমি গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন? জবাবে বললেন হাঁ, ভালো আছি। তারপর বললেন, কাল তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, কার কাছে তোমাকে রেখে যাচ্ছি, আমি তোমাকে আজকে জবাব দেয়ার অঙ্গিকার করেছিলাম। শোনো, আমি এখন সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তোমার ডান হাত বের করো। আমি হাত বের করে দিলাম। আমার ডান হাতকে তিনি তার ডান হাতে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমার এই কলিজার টুকরাকে তোমার কাছে সোপর্দ করছি। একথা বলেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

এ কথায় আমি এমন খুশি হয়েছি যে, আমার মমতাময়ী মা যদি আমার জন্য ঘরভর্তি স্বর্ণ ও মনি-মুক্তা রেখে যেতেন তাহলেও আমি এত খুশি হতাম না। (কারণ আল্লাহ যার অভিভাবক হয়ে যাবেন, তার আর চিন্তা কী?)

হজরত সায়্যিদ আহমেদ রায়বেরেলির রহ এর মা

এমন মায়ের সংখ্যা খুব বেশি হবে না, যিনি সন্তানের জানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সফল হয়েছেন। হযরতের মাতা তাকে মৃত্যুর হাতে সোর্পদ করেছিলেন; যার নমুনা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.।

একদা সায়্যিদ আহমাদ এক যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। দাইমা যেতে দিচ্ছিলেন না। মা নামাযে ছিলেন, সায়্যিদ সাহেব অপেক্ষায় ছিলেন- মা নামায শেষ করলে তারপর অনুমতি নেবেন। সালাম ফিরিয়ে তাঁর মা দাইমাকে বললেন, আহমাদের সাথে আপনার মহব্বতের সম্পর্ক অবশ্যই আছে তবে তা আমার মত নয়। এখন বাধা দেয়ার সময় নয়। যাও, আল্লাহর নাম নিয়ে বের হয়ে পড়। জিহাদের ময়দান থেকে পিঠ ফেরাবে না। অন্যথায় তোমার চেহারাও দেখাবে না আমাকে।

হজরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জ মুরাদাবাদী রহ -এর আম্মা

তাঁর মাতা একজন বড় দুনিয়াবিরাগী ও তাওয়াক্কুলের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আমার এগার-বার বসর বয়সে আমার বাবা ইন্তেকাল করেন। মা'র নিকট জমানো কিছু পয়সা ছিল, ধীরে ধীরে তাও শেষ হয়ে গেল। তারপর এল চরম অভাবের দিন। এ সময় আমার মা সর্বদা দরজা বন্ধ রাখতেন। আর বাড়িতে থাকা শাক-লতাপাতা সেদ্ধ করে খেয়ে নিতেন। আর এই দুরবস্থার কথা কাউকেই বুঝতে দিতেন না। অথচ এমন অসংখ্য মানুষ ছিল, যারা সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তা তাঁর জন্য গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্দলভী রহ -এর মা

হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. মুজাফফর নগর জেলার বিখ্যাত বংশের সন্তান ছিলেন। যার অবদানেই দাওয়াত ও তাবলীগের বিশ্বব্যাপী মেহনত দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

এ বংশকে সেসময় খোদাভীরুতা ও দ্বীনদারির মারকায মনে করা হত। এ খানদানের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ইবাদত-বান্দেগী, রাত্রি জাগরণ, যিকির ও তিলাওয়াতের বিবরণ সাধারণ মুসলিমদের বিস্মিত না করে পারে না। ঘরের মহিলারা রমযানে একা একা নফল নামাযে কুরআন খতম করা ছাড়াও ঘরের পুরুষদের পিছনে তারাবীহ ও নফলে কুরআন শুনতেন। এটা ঐ পরিবারের ঐতিহ্য ছিল।

রমযান মাস ছিল তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াতের বসন্তকাল। ঘরগুলো আবাদ থাকত কুরআন তিলাওয়াতের গুঞ্জনে।

কুরআন তরজমা, উর্দু তাফসীর, মাজাহেরে হক (মিশকাতের উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ) মাশারিকুল আনওয়ার, হিসনে হাসীন- এই পুস্তকগুলো নারীদের পারিবারিক সিলেবাস ছিল। যার পাঠন-পঠনের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

তাদের ঘরের ভিতর ও বাহিরের মজলিসগুলাতে সায়্যিদ আহমদ শহীদ ও শাহ আবদুল আযীয রাহ.-এর আলোচনা খুব বেশি হত। তাদের জীবনের কীর্তি ও অবদানগুলো পরিবারের নারী-পুরুষদের মুখে মুখে চর্চা হত। মেয়েরা মায়েরা বাচ্চাদেরকে তোতা-ময়নার গল্পের পরিবর্তে এই বুযুর্গদের ঘটনা শোনাতেন।

একদিন মাওলানা ইলিয়াস রাহ. পরিবারের মাদের এসকল ঘটনা ও বিবিরণ শোনানোর পর বললেন, এঁদের কোলে কাঁখেই আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। এখন আর এমন কোল দুনিয়াতে কোথায় পাবে!

মাওলানার নানী বিবি আমাতুর রহমান মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন রাহ.-এর কন্যা ছিলেন; যাকে এ বংশে সকলে উম্মি-বি নামে চেনে। তিনি এ কালের রাবেয়া বসরীয়া ছিলেন। জীবনসন্ধ্যায় ইবাদত-বন্দেগীর কারণে খাবারের চাহিদাও কমে গিয়েছিল। ঘরের লোকজন যদি তাঁর কাছে খাবার নিয়ে যেত, তাহলে খেতেন নতুবা খেতেন না।

কর্মব্যস্তার কারণে যদি ঘরের লোকজন ভুলে যেত, সেদিন অনাহারেই দিন কেটে যেত। কেউ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এভাবে ক্ষুধা নিয়ে কীভাবে থাকেন? জবাব দিলেন, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে আলহামদু লিল্লাহ খাবারের ব্যবস্থা হয়।

ইলিয়াস রাহ.-এর মাতা একজন বড় হাফেজা ছিলেন। তিনি বিবাহের পর কুরআন হিফ্য করেন। এত মজবুত হাফেজা ছিলেন যে, কোনো সাধারণ হাফেজ তাঁর সামনে তিলাওয়াত করা কঠিন ছিল। রমযানে প্রতিদিন এক খতম দশ পারা পড়ার রুটিন ছিল। এই তিলাওয়াতের কারণে সাংসারিক কাজে মোটেও ব্যত্যয় ঘটত না। মুখে তিলাওয়াত আর হাতে কাজ- এভাবে তিলাওয়াত জারী থাকত তাঁর।

এমন মায়ের গর্ভেই জন্ম নিয়েছেন মাওলানা ইলিয়াস রাহ.-এর মত দ্বীনের মহান দায়ীগণ।

আল্লামা ইকবাল রাহ., যার কবিতা ঈমানী চেতনায় দীপ্ত। যিনি তার কবিতার মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে নবচেতনায় উদ্দীপ্ত করেছেন। তিনি বলতেন, আমার মধ্যে আল্লাহ-রাসূল এবং দ্বীন ইসলামের প্রতি যে বিশ্বাস ও ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাও তা লাভ করেছি মায়ের কোল থেকে, তাঁর তরবিয়তে। এজন্যই উম্মতের প্রয়োজন ঈমানী চেতনায় দীপ্ত মায়ের কোল। যাদের গর্ভে জন্ম নেবে রত্ন-মানিক। উম্মতের রাহবার।

[ইসলাম মে আওরাত কা দারজাহ আওর উসকে হুকূক ওয়া ফারায়েয (পৃ. ২৪৬-২৫০) কিতাব থেকে]

উম্মতের প্রসিদ্ধ আলেমা ও মুহাদ্দিসাগণ

রিজাল শাস্ত্রের কিতাবাদিতে পুরুষদের জীবনী যেমন বিষদভাবে লিখা হয়েছে সেই তুলনায় পর্দানশীন নারীদের জীবনী সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এবং শুধু তাদের ইলমী ও দীনি কাজগুলোর উপরই সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।যেমন হাদিস সংগ্রহ, বর্ণনা, ফিকহ ও ফতোয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো।তবে তাদের

ব্যাক্তিগত ও প্রকৃতিগত যোগ্যতাগুলো পর্দার আড়ালে থেকে গেলেও তাদের প্রকাশিত যোগ্যতা ও পূর্ণতা থেকেই ভেতরের গুনাবলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এখানে কয়েকজন মুসলিম মহিলার সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যাদের বাইরের অবস্থা থেকে ভেতরের যোগ্যতা ও পূর্ণতার পরিচয় মিলে।এগুলোর বেশিরভাগ ই নেওয়া হয়েছে খতীব বাগদাদ রহ. এর তারিখে বাগদাদ,ইমাম যাহাবী রহ. এর আল ইবার ফী খবারি মান গবার,ইবনুল জাওযজাওযী রহ এর আল মুন্তাজাম ফি তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম কিতাব থেকে।আর আমি এই জীবনীগুলোর আলোচনা নিয়েছি মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী রহ এর কিতাব "ইসলামে নারীর ইলমি অবদান" থেকে। আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত বুজুর্গদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাদের এই সমস্ত খেদমতকে কবুল করুন।আর আল্লাহ তায়ালা অই সমস্ত আলেমা মুহাদ্দিসাদেরকেও জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন যাদের দীনি খেদমতে সমস্ত বিশ্বে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আমিন।

উম্মে অমর বিনতে হাসসান বাগদাদি

উম্মে অমর বিনতে আবুল গুসন হাসসান ইবনে যায়েফ সাকাফি বাগদাদি রহ. তার পিতা আবুল গুসন ও স্বামী সাইদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে কায়েস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ, আবু ইবরাহিম তারজুমানী রহ,মোহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ জারজারাই রহ,ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ হারাবী রহ এবং আলী ইবনে মুসলিম তুসী রহ।খতিবে বাগদাদি রহ বলেন,আমি নিজেও উম্মে অমর থেকে হাদিস শুনেছি এবং বর্ণনা করেছি।তার বাড়ি বাগদাদে মুয়াজ ইবনে মুসলিম এর বাড়ির কাছে ছিল। আমার বেশ কয়েকজন সাথী তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

যায়নাব বিনতে সুলাইমান বাগদাদি রহ

যায়নাব বিনতে সুলাইমান আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রহ খুব জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। তিনি তার পিতা সুলাইমান ইবনে আলী রহ থেকে হাদিস শিক্ষা করেন, আর তার থেকে বর্ণনা করেন আসেম ইবনে আলী ওয়াসেতি রহ,কাজি জাফর ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ রহ,আব্দুস সামাদ ইবনে মুসা হাশেমি রহ. এবং আহমদ ইবনে খলিল ইবনে মালেক রহ। একবার তিনি খলিফা হারুনুর রসিদের দরবারে এমনভাবে গেলেন যে, তিনি সওয়ারিতে উপবিষ্ট ছিলেন। গায়ে মুল্যবান সাদা আলখাল্লা ও দামী চাদর ছিলো। তাকে দেখেই দারোয়ানদের নায়েব আতা হারেমির দরজা খুলে দিলেন এবং তার পায়ে চুমু খেলেন।এই সময় দারোয়ান আলী ইবনে সালেহ তার থেকে একটি হাদিস ও শুনে নেন।

খাদিজা উম্মে মোহাম্মদ বাগদাদি রহ

খাদিজা উম্মে মোহাম্মদ রহ হজরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ এর কাছে গিয়ে হাদিস পড়তেন।এরপর তিনি হাদিস পড়েছেন ইয়াজিদ ইবনে হারুন রহ, ইসহাক ইবনে ইয়ুসুফ আযরাক রহ,আবু নসর হাশেম ইবনে কাসেম রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসদের কাছে।তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ এর পুত্র আব্দুল্লাহ ।আব্দুল্লাহ রহ বলেন, আমি খাদিজা ইবনে মোহাম্মদ এর কাছে ২৬২ হিজরীতে হাদিস শুনেছি। তিনি আমার পিতার খেদমতে আসতেন।এবং তার থেকে হাদিস শুনতেন এবং বর্ণনা করতেন।

বিশর হাফী রহ এর বোন

মুগদাহ,মুখখাহ ও যুহদাহ তিনজনই প্রসিদ্ধ আবেদ ও যাহেদ বিশর আল হাফী রহ এর বোন।তারা তিনজনও তাকওয়া ও পরহেজগারিতে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুগদাহ ছিলেন সবার বড়।যুহদার উপাধি হলো,উম্মে আলী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, একদিন আমি পিতার সাথে ঘরেই অবস্থান করছিলাম। এমতাবস্থায় একজন দরজায় আওয়াজ দিলো। আমি আব্বার নির্দেশে দরজা খুলে দিলাম। দেখি একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন।তিনি বললেন, আমি ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই,তার কাছে অনুমতি চাও।আমি বাবার কাছে থেকে অনুমতি নিলাম।তিনি ভিতরে এসে বললেন,হে আব্দুল্লাহর পিতা! আমি রাতের বেলা চেরাগের আলোতে সুতা কাটি।অনেক সময় তেল শেষ হয়ে চেরাগ নিভে যায়,তখন চাঁদের আলোতে কাজ করি।চাঁদের আলোতে কাটা সুতা আর চেরাগের আলোতে কাটা সুতার পারিশ্রমিকের মাঝে কোনো ভিন্নতা হবে কি না? ইমাম সাহেব বলেন, তোমার কাছে যদি পার্থক্য লাগে তাহলে বলে দিবে। এরপর তিনি বললেন, অসুস্থতার কষ্টের উপর কান্না আসা কি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ? ইমাম সাহেব বলেন, আমার মতে এটা অভিযোগ নয়।এরপর মহিলা চলে গেলেন।

আব্দুল্লাহ রহ বলেন, তার চলে যাওয়ার পর আব্বা বললেন,আমি কাউকে এ ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে শুনিনি। তুমি গিয়ে এই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করো।আমি গিয়ে জানতে পারলাম ইনি বিশর হাফী রহ এর বোন।ফিরে এসে আব্বাকে বললাম। তিনি বললেন, তার বন ছাড়া এমন মহিলা আর কেউ হতে পারে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর স্ত্রী আবাসাহ

আবাসাহ বিনতে ফযল রহ ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ -এর স্ত্রী ও তার পুত্র সালেহ এর মা।তার গর্ভে শুধু এই একটি ছেলেই জন্ম নেয়।তিনি অত্যন্ত নেককার

ও বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। ইমাম সাহেব বলেন, আমার ও তার মাঝে কখনোই কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি।ইমাম সাহেবের আগেই তার ইন্তেকাল হয়।

ইব্রাহিম খাওয়াস এর বোন মাইমুনাহ

মাইমুনা ছিলেন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হজরত ইব্রাহিম ইবনে আহমদ খাওয়াসের বোন।তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, যুহদ, ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতায় ভাইয়ের মতোই ছিলেন। একবার কেউ ইব্রাহিম ইবনে খাওয়াস এর দরজায় গিয়ে আওয়াজ দিলো।তখন তার বোন মাইমুনা গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?লোকটি ইব্রাহিম খাওয়াস এর নাম বললো। তিনি ভিতর থেকে উত্তর দিলেন,সে এখন ঘরে নেই।লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তিনি কখন আসবেন?ভেতর থেকে উত্তর এলো, যার জীবন অন্যের হাতে, তার সম্পর্কে কে বলতে পারে, সে ফিরবে কি ফিরবে না?

হুজাইমা বিনতে হুয়াই রহ

প্রখ্যাত নারী তাবেয়ি হুজাইমা বিনতে হুয়াই।তার উপনাম উম্মুদ দারদা আস সুগরা।প্রখ্যাত সাহাবী আবুদ দারদা এর দ্বিতীয় স্ত্রী। হজরত আবুদ দারদা রা দুইবার বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর নামও উম্মুদ দারদা, তবে তাকে বলা হয় বড় উম্মুদ দারদা।তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি মারা গেলে আবু দারদা রা তাকে বিয়ে করেন।

তিনি ছোটবেলা থেকে হজরত আবু দারদা রা এর হাতে লালিত পালিত হয়েছেন। হজরত আবু দারদা রা তাকে এমনভাবে গড়ে তুলেন এবং তিনিও এমনভাবে শিখেন যে,পরবর্তীতে তিনি তার স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হন।

হযরত উম্মুদ্ দারদা হুজায়মা শৈশব থেকে নিয়ে পুরো জীবনব্যাপী স্বামী আবুদ্ দারদা থেকে কুরআন-হাদীস, হেকমত তথা প্রজ্ঞা অর্জনে অক্লান্ত সাধনা করেন। একসময় তিনি স্বামীর এসব ইলমের ধারক হন।

উম্মুদ্ দারদা হযরত আবুদ্ দারদা থেকে শৈশবে কুরআন পাঠ শেখেন। আর পরে তো শিখতেই থাকেন। একসময় তিনি এক্ষেত্রে বড় বিদ্বানে পরিণত হন। এরপর তিনিও কুরআন শেখাতে থাকেন। অনেক মানুষ তাঁর থেকে কুরআন শেখে। ইবনে জাবের বলেন, ছাত্ররা উম্মুদ্ দারদার ঘরে একত্রিত হত। তাদের একজন- জুলাইদ ইবনে সাদ পড়ত। উম্মুদ্ দারদা শুনতেন এবং ভুল হলে শুধরে দিতেন। ছাত্রদেরকে এমন মেহনত করে পড়াতেন যে, এদের অনেকে পরবর্তীতে শিক্ষিকার ন্যায় কেরাতের ক্ষেত্রে ইমামে পরিণত হন। এবং যাদের নাম আজও কেরাতের ইতিহাসে ভাস্বর। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আতিয়্যা ইবনে কায়স। তিনি এমন সাধনার সাথে উম্মুদ্ দারদা থেকে কুরআন শিখেন যে, পরবর্তীতে তিনি গোটা শামবাসীর একক উস্তাযে পরিণত হন। তাঁর হস্তলিখিত কুরআনের কপিটি পাঠরীতির ক্ষেত্রে এত নিখুঁত ছিল যে, গোটা শামবাসী তাদের কুরআন মাজীদের কপি এ কপির অনুসারে শুধরে নিত। আরেকজন হলেন ইব্রাহীম ইবনে আবি আবালা। তিনি পুরো কুরআন মাজীদ একে একে সাতবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেরাতের নিয়মানুসারে উম্মুদ্ দারদা কে পাঠ করে শোনান।

উম্মুদ্ দারদা শিশুদেরও পড়াতেন। তাদেরকে যেমন কুরআন মাজীদ শেখাতেন তেমনিভাবে শ্লেটের মাধ্যমে হাতের লেখাসহ বিভিন্ন উত্তম বাণীও শেখাতেন। আবদু রাব্বিহি ইবনে সুলাইমান বলেন, উম্মুদ্ দারদা শ্লেটে আমার জন্য যেসব হিকমত লিখে দিতেন এবং শেখাতেন তন্মধ্যে একটি হল-

تعلموا الحكمة صغارا، تعلموا بها كبارا، وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر.

শৈশবেই হিকমত শিখে নাও, তাহলে বড় হয়ে আমল করতে পারবে। কেননা কৃষক সে ফসলই ঘরে তোলে, যা সে বপন করে; ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ।

কুরআনের ন্যায় স্বামী থেকে তার হাদীস ভাণ্ডারও আয়ত্ত করে নেন। স্বামীর হাদীস ভাণ্ডার কত বৃহৎ তা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। এছাড়াও তিনি সালমান ফারসী রা., আবু হুরায়রা রা., আয়েশা রা. প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস শিখেন। এক পর্যায়ে তাঁর হাদীস ভাণ্ডার বিশাল হয়ে যায়। আর শুধু শেখা নয় বরং সেগুলোকে মুখস্থ ও সংরক্ষণ করতেন

নিখুঁতভাবে। এজন্য তিনি সে যুগ থেকে নিয়ে প্রতিটি যুগে হাদীসের এক বড় বিদ্বান ও প্রামাণ্য ব্যক্তিত্বের আসনে সমাসীন হন। হাদীসের খুব কম কিতাবই পাওয়া যাবে, যাতে তাঁর হাদীস নেই। আবু আহমাদ আলআসসাল তার কিতাবে 'যাদের হাদীস সংকলিত হয়'- এ শিরোনামে একটি তালিকা পেশ করেন। সে তালিকাতে উম্মুদ্ দারদাকেও এ বলে উল্লেখ করেন, "তার থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ফলে এককভাবে তার হাদীস যেমন সংকলিত হয়, সাথে সাথে তিনি এত প্রজ্ঞাবান ছিলেন যে, তার বাণীও সংকলিত হয়।"

হাফেয যাহাবী রাহ. তাযকিরাতুল হুফফাযে বড় বড় তাবেয়ী মুহাদ্দিসগণের তালিকায় চৌদ্দ নম্বরে হযরত উম্মুদ্ দারদাকেও উল্লেখ করেন। যাহাবী এ বলে আলোচনা শুরু করেন-

كانت فقيهة عالمة عابدة مليحة جميلة واسعة العلم وافرة العقل روت الكثير عن أبي الدرداء.

তিনি বড় প্রজ্ঞাশীল আলিম ও আবিদ ছিলেন। ইলমের প্রশস্তি ছিল বেশ। আকল বুদ্ধি ছিল পূর্ণ। আবুদ্দারদা সালমান ফারসী ও আয়েশা রা. থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেন।

সে সময়ে উম্মুদ্ দারদা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। হাজারো লোক তার থেকে হাদীস শেখে। এদের মাঝে ইবরাহীম ইবনে আবি আবালা, ইসমাঈল ইবনে উবায়দুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আসলাম, রজা, সালিম ইবনে আবিল জা'দ, আবু হাযিম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, মাকহুল, আওন ইবনে আব্দুল্লাহ, আযহার ইবনে ওয়ালীদ, হারেস ইবনে উবায়দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি যাকারিয়্যা, শাহর ইবনে হাওশাব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তিনি সর্বদা হয়ত ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন নয় তো ইলমী আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, একদিন আমরা উম্মুদ্ দারদার মজলিসে ছিলাম যেখানে ইলমী অনেক আলোচনা হল। আল্লাহ্র মারেফাত নিয়েও আলোচনা হল অনেকক্ষণ। তিনি একটু ক্লান্ত হলেন। আমরা বললাম মনে হয় আমরা আপনাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা এমন বলছ, অথচ আমি সব আমলই করে

দেখেছি, কোনো আমলেই আমার অন্তর ততটুকু শীতল হয় না যতটুকু উলামা ও যাকিরীনের মজলিসে হয়।

স্বামীর দুনিয়াবিমুখতা দুনিয়াজোড়া প্রসিদ্ধ। স্ত্রীও স্বামীর থেকে তা শিখেন এবং তিনি দুনিয়াবিমুখ হন। দুনিয়াবিমুখ ও দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে যত কিতাবাদি রচনা হয়েছে সবগুলোতে তার জীবনী বা বাণীসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম যাহাবী তার জীবনীর শুরুতে এভাবে পরিচয় দেন-

طال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهد

দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন, ইলম আমল ও দুনিয়াবিমুখতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হিজরী ৮১ সন-এর পর এ মহীয়সী নারী ইন্তেকাল করেন।(মাসিক আল কাউসার,বর্ষ:১৪,সংখ্যা:৮)

সায়্যিদা নাফিসা বিনতে আল হাসান

সায়্যিদা নাফিসা বিনতে আল হাসান রহ ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন শিক্ষিকা ও হাদিস বিশারদ। তিনি ছিলেন ইমাম হাসান রা এর বংশধর।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের প্রায় একশ ত্রিশ বছর পর ৭৬২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আবু মুহাম্মদ হাসান ৫বছর খলিফা মনসুরের নায়েব ছিলেন।

মদিনার আলেমগনের কাছ থেকে সায়্যিদা নাফিসা ইলম অর্জন করেছেন।হাদিস ফিকহে তার পারদর্শীতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসহাক ইবনে জাফর মু'তামানের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি মিসর যান এবং সেখানেই বসবাস করেন। তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধনী। তাঁর জ্ঞান থেকে উপকৃত হতো শিক্ষার্থীরা, তাঁর ধন-সম্পদ থেকে উপকৃত হতো গরিব, অসহায়, অসুস্থরা।

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেন- 'সায়্যিদা নাফিসা ছিলেন ধনবতী এবং মানুষকে সহযোগিতা করতেন। কুষ্ঠরোগী, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী, রোগাক্রান্ত বিশেষ করে সাধারণ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রাখতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন অধিক ইবাদাতকারিণী, দুনিয়াত্যাগী ও অধিক পুণ্যবতী।' (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৪৫০)

তাঁর গুণী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইমাম আশ-শাফেয়ি (রহ.)। ইমাম আশ-শাফেয়ি যখন মিসর যান, তখন নাফিসা বিনতে আল-হাসানের কাছ থেকে হাদিস শিখেন। ইমাম আশ-শাফেয়ির আর্থিক সংকট দূরীকরণে নাফিসা বিনতে হাসান তাঁকে আর্থিক সহযোগিতা করেন। একজন শিক্ষিকা হিসেবে নাফিসা বিনতে আল-হাসান যেমন ইমাম আশ-শাফেয়ির জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণে সহযোগিতা করেন, তেমনি ছাত্রকে যাতে অর্থ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না হয় সেজন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। ইমাম আশ-শাফেয়ি মাঝেমধ্যে নাফিসার বাসায় যেতেন এবং তাঁর কাছে দোয়া চাইতেন।

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে এই দুজন সম্পর্কে লিখেন- 'ইমাম আশ-শাফেফি মিসরে পৌঁছলে নাফিসা বিনতে আল-হাসান তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। অনেক সময় রমজান মাসে ইমাম আশ-শাফেয়ি তাঁকে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। আশ-শাফেয়ি ইন্তেকাল করলে সায়্যিদা নাফিসা তাঁর জানাজা নিয়ে আসতে বলেন এবং তাঁর (নাফিসা) বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁর (শাফেয়ি) জানাজা পড়েন।' (আল-বৌদায়া ওয়ান নিহায়া: ১০/৪৫০)

আল্লামা সালাউদ্দিন সাফাদি (রহ.) বলেন, 'তিনি ছিলেন পবিত্র হেরেমের শায়খাহ (হাদিসের শিক্ষিকা)। তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারী ও আল্লাহসাধক ইবাদতকারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং আল্লাহর ভালোবাসায় কুমারিত্বকে বেছে নেন।' (আল ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত : ১০/৩৬৫)

বরেণ্য এই নারী মনীষী পবিত্র ৬১১ হিজরিতে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদিসবিশারদ মুহিবুদ্দিন ইবনুন নাজ্জার (রহ.) ও ফকিহ হাফেজ ওমর বিন আবদুল মজিদ আল আজদি (রহ.) তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। (মাউসুয়াতু রুয়াতুল হাদিস) (নয়াশতাব্দী/জেডআই)

ফাতিমা বিনতে আব্দুর রহমান হাররানিয়াহ রহ

ফাতিমা বিনতে আব্দুর রহমান ইবনে আবু সালেহ হাররানিয়াহ রহ এর উপনাম ছিল উম্মে মুহাম্মদ। তার জন্মস্থান বাগদাদে।তিনি সুফ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পশমের পোশাক পরিধান করতেন। ষাট বছর যাবত তিনি নামাজের বিছানাতেই শুধু একটি চাদর বিছিয়ে ঘুমাতেন।তার থেকে তার ভাতিজা আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম হাদিসের শিক্ষা অর্জন করেছেন। নয় বছর বয়সে তাকে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তার পিতা আব্দুর রহমান ইবনে আবু সালেহ রহ এর কাছে হাদিস পড়েছেন।৩১২ হিজরিতে আশি বছরের ও বেশি বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাজুন নিসা বিনতে রুস্তম বিন আবি রজা রহ.

তাজুন নিসা বিনতে রুস্তম বিন আবির রজা (রহ.) ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, আধ্যাত্মিক সাধক ও নারী ওয়ায়েজ (উপদেশদাতা)। মক্কায় তিনি হাদিসের পাঠদান করতেন এবং মানুষকে আল্লাহপ্রেমের সবক শেখাতেন।

ধারণা করা হয়, তাজুন নিসা (রহ.) ৫১৬ হিজরিতে তৎকালীন পারস্যের সমরখন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর পরিবার বাগদাদে হিজরত করে এবং তিনিও পরিবারের সঙ্গে বাগদাদে কিছুদিন অবস্থান করেন।

সর্বশেষ মক্কায় এসে স্থিত হন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর উপনাম উম্মে আইমান এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা ইরানের ইস্পাহানে বসবাস করতেন বলে তাঁকে উম্মে আইমান ইস্পাহানিও বলা হয়।

বাগদাদের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, শাফেয়ি মাজহাবের অন্যতম ফকিহ আবু সুজা জাহের বিন রুস্তম (রহ.) ছিলেন তাঁর ভাই।

যুগের পীর ও মাশায়েখরা যাঁকে 'ইমামুল মাকাম' (উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিতদের নেতা) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। (সিয়ারু আ'মুন নুবালা : ২২/১৮)

মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য হিসেবে পারিবারিক পরিমণ্ডলেই তাজুন নিসা (রহ.)-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সমরখন্দ, বাগদাদ ও মক্কার প্রসিদ্ধ আলেমদের কাছ থেকে উচ্চতর দ্বিনি ইলম অর্জন করেন। ইরাকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল ওয়াক্ত (রহ.)-এর কাছে তিনি সহিহ বুখারির পাঠ গ্রহণ করেন।

এ ছাড়া তিনি খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবু তালিব বিন খুজাইর, আবু মানসুর আল-কাজ্জাজ ও আবুল কাসিম সমরখন্দি (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। (মাউসুয়াতু রুয়াতুল হাদিস)

ইলমে দ্বিন অর্জনের পাশাপাশি তিনি আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক দীক্ষার প্রতিও মনোযোগী ছিলেন। ধারণা করা হয়, বাগদাদে অবস্থানের তরিকতের বড় বড় শায়খের মনোযোগ ও দোয়া লাভে সক্ষম হন এবং তাঁদের নির্দেশনায় নিজেকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ফলে তিনি আলোর উজ্জ্বল মিনারে পরিণত হন। পবিত্র মক্কায় অবস্থানের সময় তিনি মানুষকে ওয়াজ বা ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন।

তাঁকে মক্কার শ্রেষ্ঠ সুফি-সাধক মনে করা হতো। ইমাম তকিউদ্দিন ফাসি মক্কি (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি মক্কার সুফিদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। (আল-ইকদুস সামিন : ৮/১৯২)

তবে ভাইয়ের মতো তিনিও অন্য সুফিদের তুলনায় ব্যতিক্রম ছিলেন। কেননা সাধারণত সুফি-সাধকরা নির্ধারিত সময়ের পর কোরআন-হাদিসসহ শরিয়তের জ্ঞানচর্চা থেকে

সরে যায়। কিন্তু তাজুন নিসা (রহ.) মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন-হাদিস ও ইলমে তাসাউফের সমান্তরাল চর্চা অব্যাহত রাখেন।

আল্লামা সালাউদ্দিন সাফাদি (রহ.) বলেন, 'তিনি ছিলেন পবিত্র হেরেমের শায়খাহ (হাদিসের শিক্ষিকা)। তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারী ও আল্লাহসাধক ইবাদতকারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং আল্লাহর ভালোবাসায় কুমারিত্বকে বেছে নেন।' (আল ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত : ১০/৩৬৫)

বরেণ্য এই নারী মনীষী পবিত্র ৬১১ হিজরিতে পবিত্র মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদিসবিশারদ মুহিবুদ্দিন ইবনুন নাজ্জার (রহ.) ও ফকিহ হাফেজ ওমর বিন আবদুল মজিদ আল আজদি (রহ.) তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। (মাউসুয়াতু রুয়াতুল হাদিস)

তথ্যসূত্র:কালের কণ্ঠ

কারিমা বিনতে মুহাম্মদ বিন হাতেম মারজিয়া রহ

হাদিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিখ্যাত কিতাব সহিহ বুখারির দরসদানকারী প্রথম নারী কারিমা বিনতে আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাতেম মারজিয়া (রহ.)। তিনি ছিলেন উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, হাদিসের সনদের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমা এবং বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী। ইসলাম ও ইলমের খেদমতে তাঁর বিরাট অবদানের কারণে পরবর্তী আলেমগণ তাঁকে উম্মুল কিরাম উপাধিতে ভূষিত করেন। ইলমের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে আমৃত্যু কুমারী ছিলেন।

তিনি বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের নিকটবর্তী অঞ্চল খোরাসানের মার্ভ নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে নিজ শহর মার্ভ থেকে বের হয়ে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাস, অতঃপর সেখান থেকে মক্কা মোকাররমায় চলে যান এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই বসবাসরত ছিলেন। একজন নারীর জন্য সফরের ক্ষেত্রে

শরিয়তের বিভিন্ন হেকমতপূর্ণ বিধি-নিষেধের কারণে অন্য শায়েখদের ন্যায় তিনি নানা দেশ সফর করে ইলম অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু এ কারণে হজরত কারিমা থেমে যাননি।

নিজের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান হাদিসের বিশুদ্ধতম কিতাব সহিহ বুখারির প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং নিজ এলাকায় এই কিতাবের প্রসিদ্ধ শায়েখদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইমাম আবু হাইছাম কুশমিহানি (রহ.) থেকে বুখারির পাঠ নিয়েছেন। জাহের বিন আহমদ সারাখসি ও আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ ইস্পাহানি (রহ.) থেকেও শিক্ষা লাভ করেন। যখনই তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন তখন সনদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

হাদিসের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ইবাদত ও কল্যাণকর কাজেও তাঁর অত্যধিক আগ্রহ ছিল। উলামা ও তালাবাদের একটি বড় দল তাঁর থেকে সহিহ বুখারির হাদিস গ্রহণ করতেন। তৎকালীন শায়েখ আবু জর (রহ.) উপদেশ দিতেন যেন সবাই তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে বুখারি অধ্যয়ন না করে। আবুল গনাঈম নারসি, আবু তালিব হুসাইন বিন মুহাম্মদ জাইনাবি, মুহাম্মদ বিন বারাকাত সাঈদি, আলী বিন হুসাইন ফাররা, আবুল কাসেম আলী বিন ইবরাহিম নাসিব, আবুল মুজাফফর মনসুর বিন সামআনি (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

বুখারি অধ্যয়ন না করে। আবুল গনাঈম নারসি, আবু তালিব হুসাইন বিন মুহাম্মদ জাইনাবি, মুহাম্মদ বিন বারাকাত সাঈদি, আলী বিন হুসাইন ফাররা, আবুল কাসেম আলী বিন ইবরাহিম নাসিব, আবুল মুজাফফর মনসুর বিন সামআনি (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেন।

তাঁর ছাত্র আবুল গনাঈম নারসি বলেন, ‘হজরত কারিমা আমার জন্য বুখারি শরিফের পাণ্ডুলিপি বের করলেন।

আমি তাঁর সামনে বসে সাত পৃষ্ঠা লিখলাম এবং পড়লাম। এরপর আমি তা একা একা পুনরাবৃত্তি করতে চাইলে তিনি বললেন, না আমার সাথে মুজাকারা করো। অতঃপর

আমি তার সাথে মুজাকারা করলাম। আবু বকর ইবনে মনসুর সামাআনি থেকে বর্ণিত, নিজ উস্তাদের স্মরণকালে আমার বাবা বলতেন, কারিমার মতো আর কাউকে দেখেছ কি? তিনি আরো বলেন, আমি হজরত কারিমার ভাইয়ের মেয়ের থেকে শুনেছি যে, তিনি কখনো বিয়ে করেননি। তিনি প্রায় এক শ বছর বেঁচে ছিলেন। ইমাম জাহাবি (রহ.) এর মত অনুযায়ী তিনি ৪৬৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৮/২৩৩-২৩৪)

তথ্যসুত্রঃ কালের কণ্ঠ

আমরা বিনতে আব্দুর রহমান রহ

বিশিষ্ট তাবেয়ী আমরা বিনতে আবদুর রহমান লালিত পালিত হন আম্মাজান হযরত আয়েশা রা.-এর কোলে। আম্মাজান আয়েশা রা. আরো নবীপত্নীগণের ন্যায় নিঃসন্তান ছিলেন। তবে তিনি কিছু শিশুদের লালন পালন করতেন। যেমন তাঁরই ভাগ্নে উরওয়া, ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ। এঁদের মধ্যে একজন হলেন আমরা বিনতে আবদুর রহমান। আম্মাজান আয়েশা প্রত্যেককে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, পরবর্তীতে তারা প্রত্যেকে আমল-আখলাক, ইবাদত-বন্দেগী, দুনিয়া বিমুখতা, দ্বীনী জযবা ইত্যাদি গুণাবলিতে এবং কুরআন-হাদীস, ফিকহ তথা ইলমী যোগ্যতায়ও যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীতে পরিণত হন।

খলীফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. উরওয়া সম্পর্কে বলেন, উরওয়া অপেক্ষা (তাঁর যুগে) অধিক জ্ঞানী কেউ নেই। আর আমি মনে করি না যে, দ্বীন সম্পর্কে উরওয়ার কোনো বিষয় অজানা আছে।

কাসেম সম্পর্কে বিশিষ্ট ইমাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব রাহ. বলেন, তিনি এ উম্মতের ফকীহ। ইজলী বলেন, ইনি শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের একজন।

এদের ন্যায় হযরত আমরাকেও আম্মাজান আয়েশা ছোটবেলা থেকে গড়ে তোলেন। হতে হতে তিনিও এদের মত যুগশ্রেষ্ঠ আবেদ, যাহেদ, দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুযার, মুফতী, মুহাদ্দিসে পরিণত হন।

ইমাম যাহাবী রাহ. তাঁর সম্পর্কে লেখেন, তিনি আলেমা, ফকীহা, হাদীসের বড় ইমাম ও অনেক ইলমের অধিকারী ছিলেন।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের কথা একটু পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, একদিন কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ আমাকে বললেন, বৎস! আমি তোমাকে ইলম অন্বেষণে বেশ আগ্রহী দেখছি। আমি কি তোমাকে ইলমের ভান্ডারের সন্ধান দিব? আমি বললাম অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আমরা-এর নিকট যাও। কেননা, সে আয়েশার কোলে গড়ে উঠেছে। যুহরী বলেন, অতপর আমি তাঁর নিকট আসলাম এবং তার কাছ থেকে শিখতে থাকলাম। শিখতে শিখতে তাকে এমন অথৈ সমুদ্র পেলাম, যা নিঃশেষ হবার নয়।

ইলম অন্বেষণের পর পরবর্তীতে এই মহীয়সী নারী ইলম প্রসারেও ব্রতী হন। তাঁর হাতে অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস গড়ে ওঠে। অনেক ছাত্র তার কাছ থেকে হাদীস, ফিকহ তথা দ্বীন শেখেন।

তার ভাতিজা হারেছা, তার ভাই মুহাম্মাদ, তার ভাগ্নে আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযম, আরেক ভাতিজা ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ, ভাগ্নের ঘরের নাতী আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর, তার ছেলে আবুর রিজাল, তার নাতী মালিক, মদীনার শ্রেষ্ঠ মুফতী ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ আলআনসারী ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আম্র ইবনে দীনার, হাদীস সংকলক ইবনে শিহাব যুহরী, রায়েতা, ফাতেমাসহ অনেক বিদ্বান তাঁর হাতে গড়ে উঠেন এবং তার কাছ থেকে হাদীস শেখেন।

হিজরী ৯৭ কিংবা ৯৮ সনে এ বিদুষী নারী তাঁর কর্মমুখর জীবন সমাপ্ত করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।

তথ্যসূত্র :মাসিক আল কাউসার

হাফসা বিনতে সিরীন রহ

হাফসা বিনতে সিরীন রহ বসরা নগরীর সন্তান।নারী তাবেয়াদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির। তিনি ইলম, প্রজ্ঞা, ইবাদাত-বন্দেগী, পরহেযগারী ইত্যাদিতে হাসান বসরী ও আপন ভাই মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের সমকক্ষ। নবীজীর একান্ত খাদেম হযরত আনাস রা.-এর সাথে ছিল তার পারিবারিক সম্পর্ক। তাঁর কাছ থেকে হাফসা বিনতে সিরীনের ভাই-বোন সকলে ইলম, আমল, আখলাক শেখেন।

নুসায়বা বিনতে কা'ব নামে একজন বড় সাহাবিয়া ছিলেন।

হাফসা বিনতে সীরীন এ মহান সাহাবিয়া থেকেও ইলম শেখেন এবং তাঁর আমল, আখলাক ও প্রজ্ঞা দ্বারা আলোকিত হন। বসরাতে ছিলেন আরেক মহান তাবেয়ী আবুল আলিয়া রুফাই ইবনে মেহরান। তাবেয়ীদের মাঝে ইলম, আমল ও প্রজ্ঞায় যারা শীর্ষে, তিনি ছিলেন তাদের একজন। আবু বকর ইবনে আবু দাউদ বলেন, সাহাবীদের পর কুরআন সম্পর্কে আবুল আলিয়া থেকে বেশি জ্ঞানী কেউ নেই। হাফসা বিনতে সীরীন এ মহান তাবেয়ী থেকেও ইলম অর্জন করেন। এছাড়াও বসরার অন্যান্য আলেম থেকেও ইলম অর্জন করে। অসংখ্য ছাত্র তার থেকে ইলম আহরণ করে। ঐ যুগের বড় বড় আলেম তার থেকে ইলম অর্জন করতে আসেন। আইয়ূব আসসাখতিয়ানী, খালিদ আলহাযযা, আছিম আল আহওয়াল, আবদুল্লাহ ইবনে আওন, কাতাদা, ইবনে সীরীন, হিশাম ইবনে হাসসান, কাযী ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া। তার কাছ থেকে হাদীস অর্জন করেন।

সম্ভবত হাদীসের এমন কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যেখানে তার হাদীস নেই। কুরআন পাঠের অনেক নিয়মনীতি আছে। মদ-গুন্নাহ, মাখরাজ, সিফাত, ওয়াকফ-ওয়াস্ল-সহ অনেক বিষয় রয়েছে, যার কায়দা-কানুন অনেক। আবার কুরআনের অসংখ্য শব্দ এমনও রয়েছে, যা বিভিন্নভাবে পড়া যায়, যাকে পরিভাষায় ‘কিরাত’ বলে। এটা স্বতন্ত্র এক বিরাট শাস্ত্র। হযরত হাফসা এ শাস্ত্রেও পান্ডিত্য অর্জন করেন; বরং মাত্র বার বছর বয়সেই এ শাস্ত্র আয়ত্ব করেন।

হাফসা বিনতে সীরীন হলেন মহান তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন-এর বোন। ইবনে সীরীন ইবাদাত-বন্দেগীসহ যাবতিয় বৈশিষ্ট্যে হাসান বসরীর সমকক্ষ; বরং কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে তিনি এগিয়ে। দু’জন একই সময়ের এবং একে অপরের বন্ধু। এ ইবনে সীরীনের মত মহাপন্ডিতও কুরআনের কোনো কোনো বিষয়ে বোন হাফসার শরণাপন্ন হতেন। বর্ণনাকারী বলেন, কুরআনের পাঠরীতির কোনো বিষয়ে ইবনে সীরীনের খটকা হলে বলতেন, যাও তোমরা হাফসাকে জিজ্ঞেস কর। আর সে কীভাবে পাঠ করে শোন।

আর ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি এমন ছিলেন, যা আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য। হিশাম বলেন, তার নামাযের ঘরে জোহরের সময় যে প্রবেশ করতেন আর বের হতেন না। ইবাদত-বন্দেগীতে ডুবে থাকতেন। সেখানে আসর, মাগরিব, ইশা, ফজর পড়ে যখন ভালোভাবে সূর্য উদিত হত তখন নামায পড়ে বের হতেন। এসময় অযু গোসল ও ঘুম সেরে নিতেন। এরপর যখন যোহরের সময় হত তখন পুনরায় নামাযঘরে চলে যেতেন। মাহদী ইবনে মায়মূন বলেন, হাফসা তার নামাযের ঘরে ত্রিশ বছর ছিল; তা থেকে কোনো প্রয়োজন ছাড়া বের হত না।

বলা হয়, পূর্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতি শতাব্দীতে একজন করে জন্ম নেয়। ইয়াস তাদের একজন। এ ইয়াস ছিলেন বসরার বিচারক। তিনি বলেন, আমি যাদেরকে দেখেছি তাদের সবার থেকে হাফসাকে শ্রেষ্ঠ দেখেছি। তখন তাকে প্রশ্ন করা হল, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন থেকেও? তিনি বললেন, হাঁ, তাদের থেকেও। আবু দাউদ বলেন, নারী তাবেয়ীদের মধ্যে সেরা হলেন হাফসা। তারপর আমরা, তারপর (ছোট) উম্মুদ দারদা। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইমাম সফদী ও ইমাম যাহাবী তার জীবনী এভাবে সমাপ্ত করেন- তার সময়কার উপমাহীন এক মহান নারী। ফকীহা- দ্বীনী ইলমে প্রাজ্ঞ। অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী মহীয়সী নারী।

তথ্যসূত্র :মাসিক আল কাউসার

হজরত আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ রহ

আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ বিন আবদুল হাদি (রহ.) ছিলেন খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত নারী মুহাদ্দিস ও হাদিস গবেষক। হাদিসশাস্ত্রে তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেন যে সময়ের বিখ্যাত হাদিস গবেষকরা নানা বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ (রহ.) খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর ভাগে (রমজান ৭২৩ হিজরি) দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অভিজাত বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্য।

তাঁর পরিবার সমকালীন জ্ঞানচর্চায় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। হাফেজ আল হাজ্জার (রহ.)-এর কাছ থেকে তিনি সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ও সিরাতে ইবনে হিশামের পাঠ গ্রহণ করেন। তবে তাঁর কাছে যাওয়ার আগেই তিনি হাদিসশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

এ ছাড়া তিনি একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁদের বেশির ভাগই তাঁর পিতার বন্ধু ছিলেন। আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ (রহ.) আলেপ্পো, হামা, নাবলুস ও হেবরন অঞ্চলের একাধিক আলেমের কাছ থেকে হাদিস ও সিরাতশাস্ত্র পাঠদানের অনুমতি লাভ করেন। তবে গবেষকরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নন যে তিনি হাদিসের পাঠ নিতে এসব মুহাদ্দিসের কাছে সফর করেছিলেন, নাকি তাঁরা দামেস্কে এলে তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন।

আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর সময়ের বহু নারী ও পুরুষকে হাদিসের পাঠদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। হাদিসের জ্ঞানান্বেষণে যারা দামেস্কে আসত, তারাই তাঁর কাছে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করত। পুরুষের পাশাপাশি তিনি ৩৫ জন নারীকে হাদিসের পাঠদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি আমৃত্যু দ্বিনি শিক্ষা বিস্তারে কাজ করে যান। হাফেজ আল হাজ্জার (রহ.)-এর সান্নিধ্য তাঁকে হাদিস গবেষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

যদিও আয়েশা (রহ.) মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষকের বয়স ছিল ১০৩ বছর। শিক্ষক ইন্তেকাল করার আগ পর্যন্ত তাঁদের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

হাফেজ আল হাজ্জার (রহ.) ছাড়াও তিনি আবদুল্লাহ বিন হাসান, ইবনুজ-জাররাদ ও ইসমাইল বিন ওমর বিন হামাভি ও আবদুল কাদের বিন মুলুক (রহ.)-এর কাছ থেকে হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ফিকহশাস্ত্রে (ইসলামী আইনশাস্ত্রে) আয়েশা (রহ.)-এর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ইয়াহইয়া বিন ফাদলুল্লাহ, বোরহান জা'বারি, আবুল হাসান বান্দানিজি, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, শরফ বিন বারেজি, ইয়াহইয়া বিন সালিহ (রহ.)।

আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ (রহ.) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে হাদিসশাস্ত্রই ছিল তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। পারিবারিক অবস্থান, বাবার সহযোগিতা, নিজের প্রখর স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, দীর্ঘ জীবনকাল তাঁকে সময়ের অন্যতম প্রধান হাদিসবিশারদ হতে সাহায্য করেছিল। যদিও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করেননি, তবে সমকালীন আলেম ও বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর বিশেষ মূল্যায়ন ছিল। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি দামেস্কের জামে মসজিদে হাদিসের পাঠদানের অনুমতি পেয়েছিলেন। তাঁর ও ইমাম বুখারি (রহ.) মধ্যে মাত্র আটজন মাধ্যম বা হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানি (রহ.) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কাছে একাধিক গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস খতিব ইবনে আবি ওমর হাম্বলি (রহ.)-ও তাঁর ছাত্র ছিলেন।

আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ (রহ.)-এর মৃত্যু তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি রবিউল আউয়াল ৮১৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। আবার কারো মতে তিনি ৮৪ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে শীতল করুন। আমিন।

আয়েশা বিনতে ইউসুফ বাউনিয়াহ রহ

আয়েশা বিনতে ইউসুফ বাউনিয়া (রহ.) হিজরি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেমা ও সুফিবাদী কবি। তিনি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার জন্য সুপরিচিত ছিল। তাঁর পিতা, চাচা, ভাই ও সন্তান সবাই ছিলেন নিজ নিজ সময়ের শীর্ষ আলেম।

ফিকহ (ইসলামী আইন), হাদিস, তাসাউফ (আধ্যাত্মিকতা), ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্রে তাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর পিতা ইউসুফ শামের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। বয়স আট বছর হওয়ার আগেই তিনি কোরআন হিফজ করেন।ৃ

অতঃপর তিনি শামের বিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাহিত্যের জ্ঞানার্জন করেন। সেখান থেকে তিনি মিসরে যান এবং বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। এমনকি আয়েশা বাউনিয়া (রহ.) ফাতাওয়া প্রদান ও হাদিসের পাঠদানের অনুমতি লাভ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করার পর তিনি লেখালেখিতেই মনস্থির করেন এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ফলে বহুসংখ্যক মানুষ তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। জ্ঞানগত দক্ষতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কারণে সমকালীন আলেম, কবি-সাহিত্যিক ও পদস্থ কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। ধর্মীয় জ্ঞান ও সাহিত্যে আয়েশা বাউনিয়া (রহ.)-এর খ্যাতি ছিল প্রবাদতুল্য। ফিকহ, হাদিস ও তাসাউফ শাস্ত্রে তিনি যেমন নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তেমনি ছিলেন গদ্য ও পদ্যে অদ্বিতীয়। অন্যদিকে উত্তম চরিত্র ও আল্লাহভীতিতেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ উপমা।

তাঁর সময়ের বেশির ভাগ ঐতিহাসিক তাঁর মেধা-প্রতিভার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্যের পাঠকরা তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে। আয়েশা বাউনিয়া (রহ.)-এর বেশির ভাগ গদ্য ও পদ্যের বিষয়বস্তু ছিল ইসলাম। তিনি তাসাউফের নানাদিক, আল্লাহ

ও তাঁর নবীর প্রশংসায় কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তবে সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সহচরদের নিয়েও তাঁর রচনা রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্তুতিকাব্যে তিনি পূর্বসূরি কবিদের পথ অনুসরণ করেছেন। তাদের ভাব ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে তাঁর কবিতায়। বিশেষত তাঁর ওপর কাসিদাতুল বুরদার রচয়িতা মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল-বুসিরির প্রভাব অত্যন্ত দৃশ্যমান। যদিও তাঁর নবীপ্রেম, নিষ্ঠা ও সততা প্রশ্নাতীত। সুফিবাদী কবিতায় তিনি ইবনুল ফারিজের পদাঙ্ক অনুসরণীয় ছিলেন। গজল, কাশফ, ইলহাম, আল্লাহপ্রেম, আল্লাহর অস্তিত্বের অনুভূতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ তিনি ইবনুল ফারিজের দর্শনের আলোকেই করেছেন। সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে উপমা ও অলংকরণ, ছন্দ ও তাল, সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ও ভাব ব্যক্ত করার ঐতিহ্যগত পদ্ধতির বিচারে তাঁর কবিতাগুলো কালোত্তীর্ণ; বরং বিস্ময়কর। কবিতার আকাশে তাঁর উড্ডয়ন ছিল এমন সপ্রতিভ, যেন তিনি সমকালীন কবিদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

আয়েশা বাউনিয়া (রহ.) দুটি ‘বাদিয়াহ’ (আরবি কবিতার বিশেষ ধরন) রচনা করেন। তা হলো ‘বাদিউল বাদি ফি মাদহিশ শাফি’ এবং ‘আল-ফাতহুল মুবিন ফি মাদহিল আমিন’। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলোতে আয়েশা বাউনিয়া (রহ.)-এর ২৫টির অধিক বইয়ের নাম পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো ‘আল ফাতহুল হক্কি ফি মানহিল তালাক্কি’, ‘আল মালামিহুশ শারিফাতু ওয়াল আসারুল মুনিফাতু’, ‘মানাজিলুস সায়িরিন’, ‘আল কাওলুল বাদিউ ফিস সালাতি আলাল হাবিবিশ শাফিয়ি’ ইত্যাদি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর ভেতর ‘আল-ফাতহুল মুবিন ফি মাদহিল আমিন’ এবং গদ্যের ভেতর ‘ফাইজুল ফাজাল ওয়া জামউশ শামাল’কে শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করা হয়।

আধ্যাত্মিকতার পথে আয়েশা বাউনিয়া (রহ.)-এর মুরশিদ (পির) ছিলেন শায়খ জামালুদ্দিন ইসমাইল হাওয়ারি (রহ.) ও তাঁর খলিফা শায়খ মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আউরামারি (রহ.)। তাঁরা উভয়ে ছিলেন উচ্চ মর্যাদাশীল বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে (সম্ভাব্য) তিনি হজ করেন। জীবনের দীর্ঘ একটি সময় তিনি মিসরের কায়রো নগরীতে অতিবাহিত করেন।

আয়েশা বাউনিয়া (রহ.) আহমদ বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যার বংশধারা হুসাইন (রা.)-এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জননী ছিলেন। তারা হলো আহমদ ও আবদুল ওয়াহাব এবং আয়েশা ও বারাকাহ। আয়েশা বাউনিয়া (রহ.) ২১ ডিসেম্বর ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। স্বামী আহমদ (রহ.) তাঁর আগেই (১৫০৩ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন।

পরিসমাপ্তি

ইসলামে নারীর ইলমি অবদান অসামান্য এবং অসাধারণ। নারীরা তাদের সীমার মধ্যে থেকেই ইলম অর্জন করেছেন এবং তাদের এই ইলম দ্বারা সমস্ত উম্মাহ উপকৃত হয়েছে। ইসলামে নারীকে শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে কখনো অবহেলা করা হয়নি।বরং এই সমস্ত আলেমা, যাহেদা, ফাযেলা নারীদের থেকে এই উম্মাহর বড় বড় ইমামগণও ইলম অর্জন করেছেন। তাদের দরসে সবসময়ই ছাত্রদের ভীড় লেগে থাকত। তারা ইলম অন্বেষণ করেছেন, হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন, বড় বড় শায়েখদের থেকে হাদিসের সনদ সংগ্রহ করেছেন, হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি লাভ করেছেন।তাদের মধ্যে ছিলো চেষ্টা ,মুজাহাদা এবং দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা। নারী আলেমা, মুহাদ্দিসা, মুফাসসিরগণ তাদের বাড়িগুলোকে মাদরাসায় পরিণত করেছিলেন। তারা সেখানে দরস ও তালীম প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি তারা হাদীস বর্ণনার অনুমতি ও প্রদান করতেন।তাদের অনেককে বড় বড় উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন তৎকালীন আলেম সমাজ। ফিকহ,হাদিস, হিফযে কুরআন, তাজবীদ,তাফসীর ও ফারায়েজের ইলম ইত্যাদি প্রত্যেক শাখায় নারীদের বিশাল এক জামাত পুরুষদের পাশাপাশি যুগে যুগে দৃষ্টান্তমূলক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। তবে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা সকল ব্যবস্থাই হতো পরিপূর্ণ পর্দার সাথে এবং শরিয়তের গন্ডির ভিতরে থেকে।তাদের জন্য কোন সহশিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো না, বরল তারা মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন থেকেই মূল শিক্ষা পেতেন।তবে বিভিন্ন সময় তারা ইলম

অর্জনের জন্য অন্যান্য শায়েখদেরও দারস্থ হয়েছেন। তারপরও ইসলাম বিরোধী অপশক্তির দাবী যে, ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মাঝে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায় এবং নারীদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। তারা ইসলামের উপর নারী শিক্ষা ও নারী উন্নয়নের বিরোধিতার অপবাদ দেয়। অথচ ইসলাম নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ইলম অর্জন করাকে ফরজ করে দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নারীকে সমাজে এতো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এই সমস্ত অপশক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা এবং নারীকে ঘর থেকে বের করে এনে তাদের কৌমার্য নষ্ট করা।

আশা করা যায়, এই প্রবন্ধ দ্বারা ইসলামে নারী শিক্ষা বিষয়ে এবং যুগে যুগে নারীদের ইলম প্রচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে এবং আমরাও দীনি ইলম অর্জনে অনুপ্রাণিত হয়ে দীন ইসলামের খেদমতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারবো। এবং এই প্রবন্ধটি দ্বারা আমরা বর্তমান প্রগতিশীল নারীবাদীদের দাওয়াত দিতে পারবো। তাদের যুক্তি খন্ডন করতে পারবো।

এই প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে যত কিতাবাদী এবং প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত কিতাবাদী এবং প্রবন্ধের লেখকদের উপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের জান্নাতের পথকে সহজ করুন।

তথ্যসূত্র: ইসলামে নারীর ইলমি অবদান, কালের কণ্ঠ, মাসিক আল কাউসার,দৈনিক ইনকিলাব, bdnews24.com, THE ARAB NEWS, FATEH 24.

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110729048